গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৪ বর্ষ ২ সংখ্যা | ৬ - ১২ আগস্ট ২০২১ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা

যথার্থ আদর্শ চাই যথার্থ বিপ্লবী দল চাই

৫ আগস্ট, সর্বহারার মহান নেতা, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষের ৪৫তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁর রচনা থেকে মূল্যবান কিছু শিক্ষা এখানে তুলে ধরা হল — সম্পাদক, গণদাবী

"আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি, প্রথম যখন এই দল শুরু হয় তখন কী ছিল আমাদের? আমাদের কিছুই ছিল না। টাকা নেই, পয়সা নেই, লোকজন নেই, থাকার জায়গা নেই, কেউ চেনে না, জানে না। আর আমাদেরও বয়স বা তখন কত? আমি তখন পুরোপুরি যুবক, অল্প বয়সের একটি যুবক। সে বলছে ভারতবর্ষে সত্যিকারের কোনও বিপ্লবী দল নেই, এই দল গঠন করতে হবে। অনেকেই যুক্তি-টুক্তি শুনে বলছে, হ্যাঁ, এটা তো করা উচিত, যুক্তিগুলো তো ভালই। কিন্তু এ একটা পাগলের মতো কথা। একটা দল করা কি সোজা কথা নাকি? এতগুলো বড় বড় দল রয়েছে, তারাই সব ঘায়েল হয়ে যাচ্ছে, ভেঙে যাচ্ছে, কত কী কাণ্ড হচ্ছে। আর যাদের কেউ চেনে না, জানে না, অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোক নেই, নাম করা নেতা নেই, প্রেস পাবলিসিটি নেই তারা কী করে করবে? কিছু বললেই লোকে ঠাট্টা করত, হাসতো— এ অসম্ভব ব্যাপার! এ হতে পারে না। এসব অবাস্তব কল্পনা, ও সব হবে না। আমিও বেশি তর্ক করিনি। আমি তাদের পাল্টা প্রশ্ন করেছি। তর্কের মধ্যে না গিয়ে একেবারে সোজা মেনে নিলাম, হ্যাঁ কিছু হবে না বুঝলাম, কিছু করতে পারব না। তা হলে, কী করতে হবে বলুন। গোলামি করব? দালালি করতে হবে? বিবেক বিক্রি করতে হবে? যা বুঝেছি তা না করে অন্য রকম আচরণ করতে হবে? আমি পারব না। আমার কথা ছিল, তোমরা যারা আমার সঙ্গে থেকে লড়াই করতে পারবে তারা আমার সঙ্গে থাক, আর যারা পারবে না তারা সরে পড়। অনাহারে যদি আমাকে রাস্তাতেই মরতে হয়, আমি মরব, কিন্তু মর্যাদা নিয়ে মরব, মাথা উচু রেখেই মরব। আমি যেদিন রাস্তায় না খেয়ে মরব, সেদিনও আমি যে-কোনও অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারব। অন্যায় কাজের জন্য যে-কোনও মানুষের গালে দরকার হলে চড় বসিয়ে দিতে পারব, আমার হাত কাঁপবে না। কারণ আমাকে গুলি করে মারা যাবে, কিন্তু আমাকে কেনা যাবে না। এ ছাড়া বলুন আমি আর কী করতে পারি? আমি তো দালালি করতে পারব না। আমার এত সব বুঝেই তো বিপদ হয়ে গেছে। আমার ঠাকুরমার কোনওই অসুবিধা ছিল না। আমার বাবারও কোনও অসুবিধা ছিল না, মারও অসুবিধা ছিল না। কারণ তাঁরা ঘর সংসার করেছে, পুজো-আচ্চা করেছে, কালীবাড়ি গিয়েছে, সেখানে বারবার মাথা ঠুকে প্রণাম করেছে, বাবা সবসময় ভাবছেন, এই বুঝি স্বর্গের রথ সুর সুর করে নেমে এল এবং তিনি স্বর্গে গিয়ে আমাদের জন্য বসে থাকবেন। এ তাঁর পক্ষে কত সুবিধে। কিন্তু আমার পক্ষে অসম্ভব, কারণ আমি বুঝে ফেলেছি যে মানুষ কথাটার মানে কী, মানুষের মূল্যবোধ কী, সত্যিকারের মর্যাদা কী। আর এই দেশে জন্মগ্রহণ করার সাথে সাথে সেই মানুষ হিসাবে আমার কর্তব্য কী? আমি তো জেনেছি যে, ভারতবর্ষের এই সমাজটার পরিবর্তন না হলে আমরা কেউ বাঁচব না। আমি বাঁচব না, আমার বিবেক বাঁচবে না, নীতিনৈতিকতা বাঁচবে না, সংস্কৃতি বাঁচবে

আটের পাতায় দেখুন

শিক্ষার দাবিতে ছাত্রদের শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে পুলিশ লেলিয়ে দিল তৃণমূল সরকার

কলেজ স্ট্রিটের ছাত্রবিক্ষোভে পুলিশি হামলা। ৩১ জুলাই

করোনা অতিমারির কারণে রাজনৈতিক সভা-সমাবেশ কার্যত নিষিদ্ধ। সেই সুযোগে চলছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের তরফে একের পর এক শিক্ষা ধ্বংসকারী পদক্ষেপ। দেড় বছর ধরে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ। বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রীর পড়াশোনাও বন্ধ। তাই ছাত্র শিক্ষক অভিভাবক সকলেরই দাবি, অবিলম্বে এগুলি খুলে দাও। ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও সরকারের কাছে প্রস্তাব দিয়েছিল, ছাত্র ও শিক্ষক সংগঠন, অভিভাবক ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে এই পরিস্থিতিতে কী ভাবে শিক্ষাব্যবস্থাকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তার রোডম্যাপ তৈরি করা হোক। কিন্তু সরকার মূক ও বধিরের ভূমিকায় অভিনয় করে চলেছে। বাধ্য হয়ে ২৬ জুলাই এআইডিএসও-র নেতৃত্বে রাজ্যের ছাত্রসমাজ গোটা রাজ্যে প্রতীকী অবরোধের ডাক দেয়। শতাধিক জায়গায় ছাত্রছাত্রীরা অবরোধ করে। কিন্তু দাবিগুলি মেনে নেওয়ার পরিবর্তে আন্দোলনে তৃণমূল সরকারের পুলিশ অত্যাচার নামিয়ে আনল। বাঁকুড়ায় ১১ জন ছাত্রছাত্রীকে ব্যাপক মারধর করে জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেপ্তার করে জেলে ভরা হল। কলকাতায় ২৮ জন ছাত্রছাত্রীকে গ্রেপ্তার করা হল। এস ইউ সি আই (সি)-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ওই দিন এক বিবৃতিতে এর তীব্র নিন্দা করেন।

ছ'দিন জেলে কাটানোর পর ৩১ জুলাই ১১ জন ছাত্রছাত্রী জামিনে মুক্ত হলেন। রাজ্য জুড়ে ছাত্র শিক্ষক অভিভাবকরা প্রশ্ন তুলেছেন, জামিন অযোগ্য ধারা কীসের ভিত্তিতে? এরা কি ক্রিমিনাল? আসলে এই মিথ্যা মামলার উদ্দেশ্য আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়া। সোসাল মিডিয়া থেকে রাজপথ সর্বত্র এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। ১১ জন বন্দি দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছেন সংশোধনাগারের

দুয়ের পাতায় দেখুন

ক্ষতিপূরণের দাবিতে ইয়াস দুর্গতদের বিক্ষোভ গোসাবায়

'সুন্দরবন নদীবাঁধ ও জীবন জীবিকা রক্ষা' কমিটির আহ্বানে ইয়াস দুর্গতদের পূর্ণ ক্ষতিপূরণ ও বিজ্ঞানসম্মত স্থায়ী কংক্রিটের নদীবাঁধের দাবিতে ২৬ জুলাই গোসাবা বিডিও অফিসে বিশাল বিক্ষোভ হয়। ব্লকের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৭০০ জন উপস্থিত ছিলেন। কমিটির সভাপতি অনাথ কুমার মাইতির নেতৃত্বে ১০ জনের প্রতিনিধি দল বিডিও-র অনুপস্থিতিতে তাঁর প্রতিনিধির হাতে স্মারকলিপি দেন। বিডিও তাঁর প্রতিনিধি মারফত কমিটির কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ না পাওয়া জনগণের একটি তালিকা প্রস্তুত করে দেখা করার প্রস্তাব দিয়েছেন এবং প্রশাসন সদর্থক ভূমিকা পালন করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

গোসাবা বিডিওতে ইয়াস দুর্গতদের বিশাল বিক্ষোভ। ২৬ জুলাই

উচ্ছেদের প্রতিবাদে নাগরিক কনভেনশন

২৪ জুলাই পাঁশকুড়ার কনকপুর সিধু-কানুর মূর্তির পাদদেশে মেদিনীপুর ক্যানেলের দুই পাশে বসবাসকারী বস্তিবাসীদের উচ্ছেদের বিরুদ্ধে নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনে মহিলা সহ প্রায় পাঁচ শতাধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন সুশান্ত পাল। কনভেনশন মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলার বিভিন্ন গণআন্দোলনের নেতা মধুসূদন বেরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নাগরিক সমরেন্দ্রনাথ মাঝি, তপন জানা, জগদীশ শাসমল প্রমুখ। বক্তারা বলেন, ক্যানেল পাড়ে বসবাসকারী মানুষদের পুনর্বাসন না দিয়ে কাউকেই উচ্ছেদ করা যাবে না। উপস্থিত সবাই যে কোনও মূল্যে তা রুখবেন বলে অঙ্গীকার করেন। সভা থেকে তপন জানাকে সভাপতি এবং কার্তিক বর্মন ও জগদীশ শাসমলকে যুগ্ম সম্পাদক করে পঞ্চাশ জনের 'বস্তি উন্নয়ন কমিটি' গঠিত হয়।

সম্প্রতি সেচ দপ্তরের পক্ষ থেকে ওই ক্যানেলের দু'পাশের বাঁধের ধারে বসবাসকারী কয়েকশো বস্তিবাসীকে উচ্ছেদের নোটিশ দিলে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয় বাসিন্দাদের মধ্যে। কনভেনশনের পর উপস্থিত জনতা পুনর্বাসন না দিয়ে উচ্ছেদের প্রতিবাদে পাঁশকুড়া থানায় বিক্ষোভ দেখায় এবং আইসি-কে উপরোক্ত দাবিতে স্মারকলিপি দেন। কমিটির যুগ্ম সম্পাদক কার্তিক বর্মন ও জগদীশ শাসমল বলেন, বস্তিবাসীরা সকলেই দেশের নাগরিক, তাই তাদের পুনর্বাসন না দিয়ে উচ্ছেদ করা যায় না। পুনর্বাসন না দিয়ে জোর করে উচ্ছেদ করা হলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব।

দাবি দিবস পালন সিপিডিআরএসের

২৮ জুলাই মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গী, ইসলামপুর, দৌলতাবাদ প্রভৃতি এলাকায় সিপিডিআরএস-এর পক্ষ থেকে জেল হেফাজতে স্ট্যান স্বামীর বিনা বিচারে মৃত্যুর উপযুক্ত বিচার, স্বাস্থ্যবিধি মেনে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা, করোনা মোকাবিলায় গণটিকাকরণ, ইউএপিএ, আফস্পা ইত্যাদি দানবীয় কালা আইন বাতিল, ঘুরপথে এনআরসি-সিএএ চালু করার অপচেষ্টা বাতিল ইত্যাদি দাবিতে ২৮ জুলাই জেলা দাবি দিবস পালন করা হয় সিপিডিআরএসের পক্ষ থেকে। সিপিডিআরএস-এর পক্ষ থেকে স্থানীয় প্রশাসনিক স্তরে স্মারকলিপি দেওয়া হয় ও বিক্ষোভ দেখানো হয়। বহরমপুরে জেলাশাসকের অফিসের বিপরীতে

বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা আহ্বায়ক দেবাশীষ চক্রবর্তী, মেহেবুব আলম, লতিফ সরকার ও সুধেন্দু হাজরা প্রমুখ।

আনএমপ্লয়েড ইউথ স্ট্রাগল কমিটির প্রতিবাদ

মুম্বাইয়ে মুর্শিদাবাদের ৪ জন সহ ৯ শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক। এ রাজ্যে কাজ না পেয়ে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ভিন রাজ্যে, ভিন দেশে পাড়ি দিচ্ছেন। পরিযায়ী শ্রমিকদের মৃত্যু প্রায় নিত্যদিনের ঘটনায় পর্যবসিত হয়েছে। কোনও সরকারই অসংগঠিত শ্রমিকদের ক্ষেত্রে জীবনের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিচ্ছেন না। ২৬ জুলাই এক বিবৃতিতে এ কথা জানান, আনএমপ্লয়েড ইউথ স্ট্রাগল কমিটির রাজ্য সম্পাদক সঞ্জয় বিশ্বাস। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে দোষীদের কঠোর শাস্তি, মৃতদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, নিরাপত্তার দাবি জানান তিনি।

পুলিশ লেলিয়ে দিল তৃণমূল সরকার

একের পাতার পর

দিকে— সোসাল মিডিয়া জুড়ে ঘুরতে থাকা এ ছবি নতুন করে বাংলার বামপন্থী আন্দোলনের সংগ্রামী স্মৃতিকে মনে করিয়ে দিয়েছে।

এআইডিএসও-র বক্তব্য, পাঞ্জাব, হিমাচল, উত্তরাখণ্ড, বিহার সহ বেশ কিছু রাজ্য স্কুল খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ খুলবে না কেন? ছাত্রছাত্রীদের দ্রুত টিকা দিয়ে কোভিড বিধি মেনে স্কুল খুলতে হবে। যখন জনজীবন প্রায় স্বাভাবিক, দোকান-বাজার-অফিস যানবাহন খুলে দেওয়া হয়েছে, খুলে দেওয়া হয়েছে শপিংমল-সিনেমা হল-মদের দোকানও তখন শিক্ষার মতো অপরিহার্য বিষয় বাদ কেন, কেন ক্লাসরুম ভিত্তিক পঠনপাঠন চালু করা হচ্ছে না?

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ ঘোষণা করেছে ভারতবর্ষে অফলাইন পঠন-পাঠন শুরু করা যায়। অভিভাবকরাও চাইছেন তাদের সন্তানেরা যেন ক্লাসরুম শিক্ষার সুযোগ পায়। তখন সরকারের কেন এই অনীহা? বাস্তবে এর পিছনে রয়েছে শাসক শ্রেণির এক গভীর চক্রান্ত, যা তারা অতিমারির সুযোগে দেশজুড়ে জারি করার চেষ্টা করছে। তাদের উদ্দেশ্য শিক্ষাকে অনলাইন নির্ভর করে দেওয়া। এতে অনলাইনের কারবারিরা ফুলে-ফেঁপে উঠছে। গুরুত্ব হারাচ্ছে ক্লাসরুম নির্ভর শিক্ষা। ছাত্র-শিক্ষকের আদানপ্রদানের মাধ্যমে ছাত্রের যে নৈতিক মান গড়ে ওঠে তাও হচ্ছে না। আগামী দিনে শিক্ষক নিয়োগও মারাত্মক ভাবে কমে যাবে। অন্যদিকে গরিব-নিম্নবিত্ত ছাত্রদের কাছ থেকেও শিক্ষার সুযোগ কেড়ে নেওয়া সহজ হবে।

প্রতিবাদে রাস্তায় নামে এআইডিএসও। দাবি জানায়, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন সংখ্যা বাড়িয়ে সকল ছাত্রছাত্রীর উচ্চশিক্ষায় ভর্তি সুনিশ্চিত করতে হবে। ছাত্রদের জন্য পরিবহণে এক-তৃতীয়াংশ ভাড়া নিতে হবে। ২ জুলাই বিধানসভা গেটের বাইরে তারা বিক্ষোভ দেখায়। তখন তৃণমূল সরকারের পুলিশ ব্যাপক মারধর করে, ছাত্র কর্মীদের গ্রেফতার করে। শিক্ষাজীবনকে অবরুদ্ধ করার প্রতিবাদে ২৬ জুলাই গোটা রাজ্যে প্রতীকী অবরোধের ডাক দেওয়া হয়। এতেও নির্মম হামলা চালিয়ে শতাধিক কর্মীকে গ্রেফতার করা হল। সংগঠনের বাঁকুড়া জেলা সম্পাদক-সভাপতি সহ ১১ জন কর্মীকে জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেপ্তার করা হল। এর মধ্যে চারজন ছাত্রীকর্মী, দু'জন পরীক্ষার্থী। জেলের ভিতরে অসুস্থ হয়ে পড়লেও মেলেনি ওষুধ কিংবা প্রয়োজনীয় পোশাক। এই অমানবিক আচরণ রাজ্যবাসীকে অত্যন্ত আহত করেছে। শাসকের দমন-নীতির বিরুদ্ধে ও বন্দি ছাত্রদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে ৩১ জুলাই রাস্তায় নামে এ আই ডি এস ও, এ আই ডি ওয়াই ও, এ আই এম এস এস। কলকাতার কলেজ স্ট্রিট, হাজরা এবং প্রতিটি জেলায় ব্যাপক বিক্ষোভ হয়। কলেজ স্ট্রিটে কর্মীদের উপর পুলিশ অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে নৃশংস লাঠিচার্জ করে, মহিলা কর্মীদের চুলের মুঠি ধরে মারে, অশালীন আচরণ করে এবং ৩৮ জনকে গ্রেফতার করে।

ক'দিন পরেই স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষ উদযাপিত হবে। ভারত বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ বলে কত ভাষণের ফুলকি উড়বে। আর এ দিকে রাজপথে ঝরবে ছাত্র-যুব-শ্রমিক-কৃষকের রক্ত। এই হল স্বাধীনতার প্রকৃত রূপ! দেশের মানুষ দেখছে, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার গণতান্ত্রিক শান্তিপূর্ণ আন্দোলন দমন করার জন্য জেএনইউ, জামিয়া সহ সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের জামিন অযোগ্য ধারায় কেস দিয়ে জেলে পুরছে। গুজরাট-মধ্যপ্রদেশ-কর্ণাটক-ত্রিপুরাতে বিজেপি সরকার এআইডিএসও-র নেতৃত্বে আন্দোলনকে দমন করছে, এ রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস সরকারও ঠিক একই রাস্তা নিয়েছে। কার্যত এই সরকারও বিজেপি সরকারের সর্বনাশা জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ চালু করার পক্ষে, মুখে তারা যাই বলুক। তবে আশার বিষয় হল সারা রাজ্যব্যাপী শিক্ষাবিদ অভিভাবক এবং নানা স্তরের মানুষের এই আন্দোলনের প্রতি ব্যাপক সহমর্মিতা। বাঁকুড়া জেলায় আইনজীবীদের স্বতঃস্ফূর্ত সওয়ালে অবশেষে ১১ জন সংগঠককে জামিন দিতে বাধ্য হয় রাজ্য প্রশাসন। আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ পৌঁছে গেছে রাজ্যের প্রান্তে প্রত্যন্তে। আন্দোলনের প্রতি গভীর আবেগ ব্যক্ত করেছেন বহু সাধারণ মানুষ। এক পুলিশ কর্মচারী বলেছেন, 'উর্দি পরে প্রশাসনের আদেশ পালনে বাধ্য হলেও, আমিও এক ছাত্রের বাবা। আমি জানি আমার সন্তানের ভাল হবে এ আন্দোলন জয়যুক্ত হলে। তোমরা লড়াই চালিয়ে যাও, তোমাদের জয় নিশ্চিত।' শত শত মানুষের আকাঙ্খাকে বুকে নিয়ে এআইডিএসও শপথ গ্রহণ করেছে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। শিক্ষার ওপর নেমে আসা আক্রমণ সহ যে কোনও অন্যায় অনাচারের বিরুদ্ধে বারবার আন্দোলনে মুখরিত হবে তারা (আন্দোলনের আরও ছবি চারের পাতায়)।

ভ্রম সংশোধন ঃ ৩০ জুলাই ২০২১-এর গণদাবী ৭৪ বর্ষ ১ সংখ্যার পরিবর্তে ভুলক্রমে ৭৩ বর্ষ ৪১ সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে। অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটির জন্য আমরা আন্তরিক ভাবে দুঃখিত।

জীবনাবসান

বাঁকুড়া জেলার হিড়বাঁধ ব্লকের অন্তর্গত তিলাবনি গ্রামে দলের কর্মী কমরেড বনমালী মণ্ডল দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ৫ জুলাই মুম্বাই ক্যান্সার হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৭ বছর। ৬ জুলাই তাঁর মরদেহ তাঁর গ্রামে নিয়ে আসা হয়। শেষযাত্রায় দলের কর্মী সমর্থক সহ বহু সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

আশির দশকের শেষভাগে বাঁকুড়ার হিড়বাঁধ সহ আশেপাশের অঞ্চলে দলের কাজকর্ম শুরু হয়। কমরেড বনমালী মণ্ডল প্রথম থেকেই যুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার ও সংবেদনশীল মনের মানুষ। তাঁর বাড়ি ছিল সমস্ত কর্মী-সমর্থকদের জন্য অবারিত। তিনি তাঁর স্ত্রী পুত্রকেও দলের সাথে যুক্ত করেছেন। বেশ কয়েক বছর ধরে গুরুতর অসুস্থ থাকায় সব সময় সক্রিয়ভাবে কাজ না করতে পারলেও তিনি দলের অত্যন্ত বিশ্বস্ত ছিলেন এবং সমস্ত কর্মীদের নানাভাবে উৎসাহিত ও সাহায্য করতেন। তাঁর প্রয়াণে দল একজন সংবেদনশীল, দরদি ও বিশ্বস্ত কমরেডকে হারাল।

১৬ জুলাই তিলাবনি গ্রামে হিড়বাঁধ লোকাল কমিটির উদ্যোগে আড়াই শতাধিক মানুষের উপস্থিতিতে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জেলা সম্পাদক কমরেড জয়দেব পাল, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অসিত মণ্ডল, বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী খাতড়া কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপিকা মঞ্জু চক্রবর্তী সহ আরও অনেকে বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন জেলা কমিটির সদস্য কমরেড নরেন কুম্ভকার।

কমরেড বনমালী মণ্ডল লাল সেলাম

‘আমরা এসইউসিআই(সি)-কে ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টি বলে মনে করি’

তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসে কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-র প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী গত ৬ জুলাই ঢাকাতে প্রয়াত হন। ২১-২৫ নভেম্বর ২০১৮ ঘাটশিলায় অনুষ্ঠিত এস ইউ সি আই (সি)-র তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে কমরেড চৌধুরী আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। ২১ নভেম্বর তিনি ইংরেজিতে যে উদ্বোধনী ভাষণ দেন তার বাংলা অনুবাদ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসাবে আমরা প্রকাশ করলাম।

কমরেডস,

আমাদের পার্টি বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-র পক্ষ থেকে আমি এস ইউ সি আই (সি)-র তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসে উপস্থিত সকল প্রতিনিধি কমরেডকে অভিনন্দন জানাই। আমার সংক্ষিপ্ত পরিচয় আপনাদের প্রিয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ আপনাদের সামনে রেখেছেন। আমি সেগুলোর পুনরাবৃত্তি করব না। আমি প্রথমে বলতে চাই, কী ভাবে আমার সীমাবদ্ধ ক্ষমতা নিয়ে মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের অমূল্য শিক্ষা আমি বাংলাদেশে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলাম। আপনারা হয়তো জানেন, ঢাকার কাছে একটি ছোট্ট গ্রামে কমরেড শিবদাস ঘোষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেখান থেকেই তাঁর রাজনৈতিক কাজকর্মের শুরু। প্রথমে অনুশীলন সমিতিতে তিনি যুক্ত হন, তারপর রেভলিউশনারি সোস্যালিস্ট পার্টি (আরএসপি) নামে একটি মার্কসিস্ট-লেনিনিস্ট কমিউনিস্টপার্টি গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। সেই পার্টির মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী পেটিবুর্জোয়া আপসহীন সংগ্রামী ধারার প্রভাব যথেষ্ট ছিল। ব্রিটিশ শাসনকালেই তাঁরা দেখেছিলেন সিপিআই একটি প্রকৃত কমিউনিস্ট বিপ্লবী পার্টি হিসাবে গড়ে ওঠেনি। তাই নতুন করে একটি কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু সে পার্টিও আদতে পুরনো অনুশীলন সমিতিরই অনুসারী ছিল এবং ফলে তা বাস্তবে একটি পেটিবুর্জোয়া বিপ্লবী পার্টি হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৪২ সালে কমরেড শিবদাস ঘোষ গ্রেপ্তার হয়ে যান। আপনারা আমার থেকে ভালই এসব জানেন। আমি কী করে কমরেড শিবদাস ঘোষের সংস্পর্শে প্রথম এলাম তাই আপনাদের বলি।

এস ইউ সি আই (সি) প্রথমে একটি প্ল্যাটফর্ম অব অ্যাকশন হিসাবে কাজ শুরু করেছিল। তারপর ১৯৪৮ সালের ২৪ এপ্রিল পশ্চিমবাংলার জয়নগরে একটি কনভেনশনের মধ্য দিয়ে পার্টি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালীন কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সদস্য কমরেড মনোরঞ্জন ব্যানার্জী— যিনি পরবর্তীকালে আর রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে থাকতে পারেননি, কিন্তু সে সময় শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনে সামিল ছিলেন— তাঁর মাধ্যমে আমি দলের সংস্পর্শে আসি। আমি শৈশবেই বাবা-মাকে হারিয়েছিলাম। খিদিরপুরের বন্দর এলাকায় আমার বড় ভাইয়ের বাসায় তখন আমি থাকতাম, সেখানেই আমি তাঁর সাথে পরিচিত হই। তিনি আমাকে কমরেড শিবদাস ঘোষ পরিচালিত একটি স্টাডি সার্কেলে নিয়ে যান। সে সময় আমি স্কুলশিক্ষার দিক থেকেও বেশ দুর্বল ছিলাম। আমি মাত্র অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনার সুযোগ পেয়েছিলাম।

আমি যখন কমরেড শিবদাস ঘোষের কাছে এলাম, তাঁর কথাবার্তা, আলোচনা এবং তাঁর সংস্পর্শ আমাকে প্রবল ভাবে আকর্ষণ করে। মার্কসীয় বইপত্র তেমন বিশেষ পড়াশোনার দ্বারা নয়, তাঁর বক্তব্য ও তাঁর সাথে মেলামেশার মাধ্যমেই আমার মধ্যে মর্যাদাময় জীবন যাপনের ধারণা জন্ম নেয়। আমি ট্রেড ইউনিয়নের কাজে যুক্ত হই। পুলিশ আমার খোঁজে একদিন আমার বাড়ি সার্চ করেছিল। আমার বড়ভাই এতে ভয় পেয়ে যান। তিনি পাকিস্তানি (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান, বর্তমান বাংলাদেশ) মানুষ ছিলেন বলে ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন। তিনি আমাকে জানিয়ে দেন তাঁর বাড়িতে আর থাকা হবে না। সেই সময়ে এস ইউ সি আই (সি) খুবই সমস্যাসঙ্কুল অবস্থায় ছিল। তাই কমরেডরা যে কমিউনে থাকতেন সেখানেও আমার থাকা সম্ভব ছিল না। আমি ভাইয়ের বাড়ি থেকে বেরিয়ে কলকাতা সংলগ্ন বাটা এলাকার রাস্তায় কাটাতাম। কলকাতার কমরেডরা সে এলাকা জানে। আমি খবরের কাগজ পেতে রাস্তায় শুতাম। পুলিশ এসে আমার ঘুম ভাঙিয়ে তুলে দিত। এমনি করেই তখন দিন যেত। এর মধ্যেও আমি প্রায় সবদিনই প্রবল আকর্ষণে খিদিরপুর থেকে দশ কিলোমিটার পায়ে হেঁটে শ্যামবাজারের টালায় কমরেড শিবদাস ঘোষের কাছে যেতাম তাঁকে দেখতে এবং তাঁর সাহচর্য পেতে। আমি তাঁর সাংস্কৃতিক, এথিক্যাল, নৈতিক আচার আচরণের দ্বারা উদ্দীপ্ত হই। আমি জানতাম, তাঁদেরও খাওয়া-দাওয়ার সংকট ছিল। আমার তো আরও খারাপ অবস্থা, তাই তাঁদের অসুবিধায় না ফেলার জন্য দুপুরে খাবার সময়ের পরেই যেতাম। আমার রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ওই সময়ই কমরেড প্রভাস ঘোষ, কমরেড রণজিৎ ধর তাঁরাও খুব দুঃসহ অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেছেন। রণজিৎ ধর কালীঘাটের হালদার পাড়ায় থাকতেন। কখনও কখনও আমি ও প্রভাস ঘোষ কোনও খাবার না খেয়েই পার্কে শুয়ে রাত কাটিয়েছি। দক্ষিণ কলকাতার দেশপ্রিয় পার্কের বেঞ্চেও আমরা ঘুমিয়েছি। এই দু’জন কমরেড তখন নানা ভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। সামান্য খাবার পেলেও আমার জন্য ভাগ রেখেছেন। আমিও দু’চার আনা পয়সা জোগাড় করতে পারলে প্রভাসের খোঁজ করতাম, ভাগাভাগি করে খাওয়ার জন্য। এই রকমেরই অবস্থা যাচ্ছিল তখন। আমার মধ্যে কিছু ডেডিকেশন, মিলিট্যান্সি এবং সাহস দেখে কমরেড ঘোষ আমাকে কিছু কাজ নির্দিষ্ট করে দেন। আমি সর্বদা তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারিনি। কারণ চরিত্র তৈরি করা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সেই সময়ে সঠিক বিপ্লবী চরিত্র গড়ে তোলার সংগ্রামই ছিল তাঁর মহত্ত্বপূর্ণ শিক্ষা, যার বহু কিছু আমি অর্জন করতে পারিনি। সেই জন্য আমার চলার পথে অনেক ব্যর্থতা আছে। তিনি আমারপ্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন কখনও কখনও, কিন্তু ধৈর্য হারাননি। তিনি আমাকে খুবই উৎসাহ দিয়েছেন।

তখন স্বর্ণশিল্পীদের একটা বড় আন্দোলন হয়। সারা ভারত জুড়ে এক বড় সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি আমাকে স্বর্ণশিল্পীদের সংগঠিত করতে বললেন। আমি প্রয়াত কমরেড মাধব রায়চৌধুরীকে নিয়ে বহু জায়গায় স্বর্ণশিল্পীদের সংগঠিত করতে থাকলাম। তিনিও আমার ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। অনেক মানুষকে আমরা সংগঠিত করেছিলাম। স্বর্ণশিল্পীদের পক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট একটি আকর্ষণীয় সংক্ষিপ্ত এবং সুনির্দিষ্ট দাবিপত্র তুলে ধরা হয়। কমরেড শিবদাস ঘোষই এই দাবি সনদ তৈরি করে দিয়েছিলেন। একটি সংবাদপত্র পুরো দাবিপত্র ছাপিয়ে ছিল, পার্টির নাম সেখানে ছিল না। স্বর্ণশিল্পীদের আকর্ষণীয়, সঠিক ও সুনির্দিষ্ট দাবি সনদ হিসাবে সংবাদপত্র তা প্রকাশ করে। এই আন্দোলনের পর আমাকে, কমরেড প্রভাস ঘোষকে এবং আরও কিছু কমরেডকে বীরভূম জেলায় তিনি পাঠান। সেখানে কমরেড প্রতিভা মুখার্জী চাষি আন্দোলন পরিচালনা করে খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। বিশেষত তথাকথিত নিম্নবর্ণ হিন্দুদের যাঁদের ‘ছোটলোক’ বলে ওখানকার জমির মালিকরা বলত, তাঁদের মধ্যে ও আদিবাসীদের মধ্যে আন্দোলন গড়ে তুলে তিনি ‘দিদিমণি’ নামে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। আমরা তাঁদের সংগঠিত করতে চেষ্টা করি। ১৯৬২ সালের নির্বাচনে কমরেড প্রতিভা মুখার্জীকে কেন্দ্র করে আমরা কাজ শুরু করি। সেখানে কাজ করার অবস্থা তখন খুবই সঙ্কটপূর্ণ ছিল। জোতদাররা প্রচণ্ড বাধা দিত, আমাদের মারধর করত, থাকা-খাওয়ার জায়গাও প্রায় মিলত না ওদের ভয়ে। কমরেড শিবদাস ঘোষ মাঝে মাঝে আমাদের সেখানে কাজ করতে পাঠাতেন। সেখানে এসব বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও জনসাধারণের মধ্যে কাজ করে আমি অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি।

১৯৬৪ সালে কলকাতায় একটি বড় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। তখন কমরেড শিবদাস ঘোষ সাম্প্রদায়িক সমস্যার উপর একটি প্রবন্ধ লেখেন— ‘কমিউনাল ডিস্টারবেন্স ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান’। সাম্প্রদায়িক সমস্যার মূল কারণ কী ও সমাধান কোন পথে, এই প্রসঙ্গে আলোচনা ছিল। এই পুস্তিকা নিয়ে আমি মুসলিম সমাজের বহু বুদ্ধিজীবী এবং নামকরা ব্যক্তিদের সাথে দেখা করি। আমি যখন দিল্লি যাই এই বই বিশিষ্ট বামপন্থী ইতিহাসবিদ ইরফান হাবিবকেও দিয়েছিলাম। এঁরা সকলেই বলেন, এ ভাবে কেউই ইতিপূর্বে এই সমস্যার বিশ্লেষণ করেননি। কলকাতায় আমি কিছু যুবককেও সংগঠিত করি। একদিন কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন এই যুবকদের নিয়ে তোমার কী পরিকল্পনা? আমি বলি, আপনি কিছু পরামর্শ দিন। তিনি বলেন, তুমি একটা যুব সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা কর। তখন আমি ডি ওয়াই ও সংগঠিত করার কাজ শুরু করি। এরপর আমি একটা কনফারেন্সে দিল্লিতে যাই। কমরেড শিবদাস ঘোষ তখন সেখানে ছিলেন। তাঁকে বিশেষ কারণে দিল্লিতে পাঠানো হয়। ডি ওয়াই ও-র এক সদস্য আমাকে চিঠি দিয়ে জানান যে তাঁর এক আত্মীয় দিল্লি যাচ্ছেন, গণদাবী পড়তে তাঁর আগ্রহ আছে, আমি দিল্লিতে তাঁর সাথে যেন যোগাযোগ করি। সে সময় এস ইউ সি আই (সি)-র একজন এম পি ছিলেন— কমরেড চিত্ত রায়। তাঁর কোয়ার্টারে আমরা থাকতাম। দিল্লিতে যোগাযোগের ব্যক্তিরা ওই বাড়িতে এসে কমরেড শিবদাস ঘোষের সাথে মিলিত হতেন। এইভাবেই দিল্লি রাজ্য পার্টির কাজ শুরু হয়। একদিন কমরেড ঘোষ আমাকে বলেন, তুমি আর ডি ওয়াই ও-তে নয়, এবার তোমাকে দিল্লিতে কাজের জন্য থাকতে হবে। আমি দিল্লিতে থাকতে শুরু করলাম। আমি মাঝে মাঝে পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুর, মোরাদাবাদ, গাজিয়াবাদ প্রভৃতি জায়গায় যেতাম এবং সে সব স্থানে বেশ কিছু মানুষের সাথে যোগাযোগ হয়। একদিন মাথুর নামে যমুনা এলাকার এক ব্যক্তির সাথে আমার দেখা হয়। সে গাড়ি নিয়ে এসেছিল একটি বৈঠকে কমরেড চিত্ত রায়কে নেওয়ার জন্য। সেখানে অন্য বক্তা হিসাবে সি পি আই নেতা ভূপেশ গুপ্ত ও সি পি এম নেতা রামমূর্তিও ছিলেন। সেই সময়ে পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার চলছিল। কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী শ্রমমন্ত্রী ছিলেন। রাজ্য জুড়ে ঘেরাও আন্দোলন চলেছিল। উত্তর ভারতেও এই ঘেরাও আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। এমনকী ঘেরাও আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল পূর্ব পাকিস্তানেও, যেটা এখন বাংলাদেশ। সেই দেশের প্রখ্যাত নেতা মৌলানা ভাসানিও ঘেরাও আন্দোলন শুরু করেন। তা এক অন্য ইতিহাস, আমি তার মধ্যে যেতে

ছয়ের পাতায় দেখুন

‘হায়দার ভাই আমাদের জীবনবোধকে পাল্টে দিয়েছেন’

কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা ও শিক্ষার ভিত্তিতে বাংলাদেশে একটি যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার সংগ্রামে অক্লান্ত পরিশ্রম করে কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী ওই দেশের সমাজের কত গভীরে পৌঁছেছেন এবং বিভিন্ন স্তরের কত মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলেছেন, তার কিছু পরিচয় এবার তাঁর মৃত্যুর পর সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। তারই কিছু অংশ আমরা এখানে প্রকাশ করলাম।

বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বুদ্ধিজীবী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ঃ মেরুদণ্ড সবারই থাকে, থাকতে হয়; কিন্তু শক্ত মেরুদণ্ড বেশ বিরল। আমাদের এই কমরেডের মেরুদণ্ড ছিল বিস্ময়কর রকমের দৃঢ়। কোনও অবস্থাতেই তিনি নড়তেন না। সঙ্কটে থাকতেন ধীর ও স্থির। ... বস্তুত সংস্কৃতিতে ছিল তাঁর বিশেষ অবস্থান। তাঁর নিজের সংস্কৃতিতে ছিল পরিচ্ছন্ন রুচি ও বৈজ্ঞানিকতা। সংস্কৃতিকে উন্নত করতে না পারলে যে সামাজিক বিপ্লব ঘটবে না, এটা তাঁর দল জানত, হায়দার ভাইও জানতেন বিশেষভাবে। আর ছিল নৈতিকতার বোধ। রাজনৈতিক নীতির প্রশ্নে যেমন অবিচল ছিলেন, তেমনি ব্যক্তিগত নৈতিকতার ব্যাপারেও ছিলেন অত্যন্ত শক্ত। শক্ত হতে তিনি অন্যদেরও বলতেন। নৈতিক মেরুদণ্ড যে দৈহিক মেরুদণ্ডের চাইতেও অধিক কার্যকর এটা তাঁকে দেখে নতুন করে বুঝতাম। মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর ভেতর আত্মপ্রকাশের কোনও আগ্রহ ছিল না। নিজেকে তিনি প্রচ্ছন্ন রাখতে চাইতেন। সেটাও ছিল তাঁর সংস্কৃতি ও নৈতিকতার অংশ। ভাবতেন তিনি জীবিত ও জীবন্ত থাকবেন তাঁর কাজের মধ্যে। কাজই হবে তাঁর পরিচয়। কাজে তাঁর বিরাম ছিল না। কিন্তু আবার অস্থিরতাও দেখিনি। রাজনীতিকদের মধ্যে তাঁর মতো অঙ্গীকারবদ্ধ অথচ মৃদুভাষী মানুষ আমি খুব কম দেখেছি। যুক্তি ছাড়া কথা বলতেন না, অথচ বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ছিলেন অনড়।

মহিউদ্দিন আহমেদ ঃ সবচেয়ে আর্টিকুলেট, সজ্জন, সত্যবাদী ও নির্লোভ মানুষ। তাঁকে ধারণ করার ক্ষমতা ছিল না এই দলগুলোর।

মাহমুদুর রহমান মান্না ঃ জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁর বিশ্বাসের ভিত্তিতে রাজনীতি করে যান। ব্যক্তিজীবনে প্রতিষ্ঠা পাননি। রাজনৈতিক জীবনে পরিচিতি, জনপ্রিয়তা, প্রতিষ্ঠাও পাননি। তার চেয়ে বড় কথা, এ সবের কোনও কিছুই তাকে কখনও স্পর্শ করেনি। একেবারে নির্মোহ, নির্লোভ ছিলেন তিনি, বর্তমান বাংলাদেশের রাজনীতিতে যা বিরল। তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা।

খান আক্তার আলিম ঃ তাঁর ব্যক্তিত্ব, পাণ্ডিত্য, স্টাইল, বাচনভঙ্গি আর পৌরুষ ছিল মুগ্ধ করার মতো। ... ধ্রুপদী মার্কসীয় সাহিত্য ছাড়াও ক্রীড়া বা রাগসঙ্গীত, প্রসঙ্গ হতে প্রসঙ্গান্তরে তাঁর বিচরণকে মনে হত যেন জীবন্ত এক রূপকথার ভ্রমণ। বলতে দ্বিধা নেই, ধ্রুপদী মার্কসীয় সাহিত্যের বাইরে বিশাল জ্ঞানভাণ্ডারে হায়দার ভাইয়ের বিচরণ ছিল অতি সহজ, সাবলীল, প্রাণবন্ত আর আনন্দময়। ... এই যে লোভকে জয় করার, ত্যাগ করতে শেখার, ভালোকে আঁকড়ে ধরার, বৈষম্যহীনতাকে ভালবাসার শক্তি আর সাহস, এতে কি আপনার অবদান নেই? এখানেই আপনার নীরব উপস্থিতি। ... আমরা যারা তাঁর সান্নিধ্য পেয়েছি, তারা বিরল ভাগ্যবানদের একজন মনে করি। হায়দার ভাই, আপনাকে সমালোচনার সাহস করি, কিন্তু ভালবাসি তার চাইতে অনেক অনেক বেশি। আপনি যা দিয়েছেন তার ঋণ তো শোধবার নয়। আপনি আমাদের হৃদয়ে উজ্জ্বল থাকবেন হায়দার ভাই।

নাসিরুদ্দিন প্রিন্স ঃ হায়দার ভাই অনেকটা ধ্রুপদী সঙ্গীতের মতো। আলাপের সময়টাতে তার তেজ বোঝা যায় না। কিন্তু রাগের পর্যায়ে তা থেকে আর বিচ্ছিন্ন হওয়া যায় না। আচ্ছন্ন করে ফেলে শরীর মন। সেই থেকে প্রেমে পড়ে যাই হায়দার ভাইয়ের। ... বিপ্লবই যে জীবন এবং এই বিপ্লবী জীবনই যে মর্যাদার জীবন, অন্য সব কিছু দাসত্ব, তা সেই সময়ের তরুণ মনে প্রগাঢ়ভাবে গেঁথে দিয়েছিলেন হায়দার ভাই।

আসরাফুল হক মুকুল ঃ হায়দার ভাই আমাদের জীবনবোধকে পাল্টে দিয়েছেন, এমনভাবে পাল্টে দেওয়ার মানুষ আজ নেই বললেই চলে।

বেলাল চৌধুরী ঃ হায়দার ভাই আমাদের চিন্তাজগতকে প্রচণ্ড শক্তিতে নাড়া দিয়েছিলেন, ভীষণ আলোড়িত, আন্দোলিত করেছিলেন। পাল্টে দিয়েছিলেন আমাদের প্রচলিত জীবনবোধ।

মশিউর রহমান ঃ আমি তাঁর মতো এমন প্রবল তাড়না আর বেদনা নিয়ে এত স্পষ্টভাবে আর কাউকে পুঁজির শৃঙ্খল উৎখাতের স্বপ্ন প্রচার করতে দেখিনি। আমার সময়ে তত্ত্বের শরীরে এতটা জীবন হায়দার ভাই ছাড়া আর কেউ সঞ্চার করতে পারতেন বলে আমি জানি না। ... তিনি বলেছেন। অনেক মহৎ কথা বলেছেন। ... যাকে যতটুকু বলেছেন, আমি দেখেছি সে সেই ততটুকুকেই কী প্রবল ভালবাসা দিয়ে হৃদয়ে নিবিড়তম জায়গায় স্থান দেয়। মণিমুক্তার মতো আগলে রাখে। অন্ধকারে জ্বেলে রাখে।

অজয় কুমার ঃ যিনি শেখান না, শেখার আকাঙ্খা তৈরি করে পথ দেখিয়ে যান।

সত্যজিৎ বিশ্বাস ঃ রাজনীতি যে শুধু মিটিং-মিছিল, সভাসমাবেশ নয়, সামগ্রিক এক জীবনবোধ তা বুঝতে শিখেছিলাম কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর সান্নিধ্যে এসে।

জহিরুল ইসলাম ঃ হায়দার ভাই প্রচারবিমুখ মানুষ ছিলেন। হয়তো বলতেন, আমি আর এমন কী করেছি। শিবদাস ঘোষের উপর ছবি বানাও। ... নিপীড়িত মানুষের মুক্তির জন্য জান বাজি রেখে লড়েছেন। জাসদ, বাসদের মতো দুটো বড় পার্টির রাজনৈতিক থিসিস, রণনীতি, রণকৌশল নির্ধারণে তার বড় ভূমিকা ছিল।

মাহমুদুল হক আরিফ ঃ মস্কো বা পিকিংপন্থী না হয়েও যে বাম আন্দোলনের গতিপথ নির্দেশিত করা যায় বা দ্বন্দ্বতত্ত্বের ভিত্তিতে যে নির্মোহ বিচারধারা গড়ে তোলা সম্ভব সেই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে পরিচয় ঘটিয়ে দিলেন কমরেড হায়দার চৌধুরী। কমরেড শিবদাস ঘোষ এই বিচারধারাটি দিয়ে পাঠিয়েছেন তাঁকে, এটাই তাঁর বড় হাতিয়ার। চিন্তাপদ্ধতির হাতিয়ার। বাম আন্দোলনে চিন্তার জায়গাটি তিনি তাই বারবার পরিষ্কার করেছেন। জটিল মনস্তাত্ত্বিক আলোচনা হোক, আর সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতির তাত্ত্বিক আলোচনাই হোক, আলোচনা শেষে তিনি যাঁকে পুরো কৃতিত্ব দিতেন তিনি হলেন কমরেড শিবদাস ঘোষ। বারবার তিনি শিবদাস ঘোষের নামটি নিতেন। মুবিনুল হায়দার চৌধুরী আপনার ঋণ কি শোধ হয়েছে, এই চিন্তায় উদ্ভাসিত কিছু তরুণ এখনও এই কাজটি এগিয়ে নিয়ে যাবে। আপনার গড়া পার্টি যেদিন এই দেশের নিপীড়িত মানুষকে বৈষম্যমুক্তির দিশা দেবে, হয়তো সেই দিন আপনার ঋণ শোধ হবে। কিছু কিছু সঙ্গীত থাকে ধ্রুপদী, সে সুর যুগের পর যুগ হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়। কিছু কিছু নদী থাকে প্রধান নদী, জলকে বয়ে নিয়ে যায় সমুদ্রের মোহনায়। কিছু কিছু কবিতা থাকে কণ্ঠে কণ্ঠে বিদ্রোহ করে, বিদ্রোহী কবিতায়। কিছু কিছু মানুষও কি থাকে যিনি ধ্রুপদী মানুষ বা প্রধান নদী? থাকে বৈকি। সফেদ পোশাকে টানটান শিরদাড়া উঁচু করে হেঁটে যাওয়া মানুষ কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী নিমেষে পাল্টে দিতে পারেন প্রচলিত ধ্যানধ্যারণা, তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারেন পুরাতন জীবনবোধ।

সুজয় সাম্য ঃ হায়দার ভাই আমার দেখা বামপন্থা রাজনীতির সবচেয়ে দৃঢ়চেতা মানুষদের একজন। ওনার আর একটা বিষয় সিগনিফিক্যান্ট। প্রবল মেল ডমিনেটিং সমাজে অনেক পুরুষকে উনি মানুষ হিসাবে গড়ে তুলেছেন। অনেক পুরুষ আপ্রাণ চেষ্টা করেছে ডমিনেটিং পুরুষ হওয়ার বদলে মানবিক একজন মানুষ হয়ে ওঠার জন্য। ফলে ওনার সংগঠনে নারীরা অনেক বেশি নিরাপদ বোধ করে। যেটা আমি সমাজের আর কোনও অংশে দেখিনি। নৈতিকতার ও মূল্যবোধের প্রশ্নটাকে উনি অসম্ভব গুরুত্ব দিয়ে সামনে আনতে পেরেছিলেন।

প্রেমানন্দ দাস ঃ হায়দার ভাই বলতেন উন্নত চরিত্র ও মূল্যবোধ অর্জন করতে না পারলে বিপ্লবী আন্দোলন কোনও দিন সফল হবে না। শিবদাস ঘোষের সেই শিক্ষার কথা বারবার স্মরণ করিয়ে হায়দার ভাই আমাদের উন্নত মূল্যবোধ অর্জনে অনুপ্রাণিত করতেন। আজ যতটুকু নৈতিকবোধ অন্তরে ধারণ করি, তার শিক্ষাটুকু এই মানুষটার কাছ থেকে পেয়েছি। উন্নত চরিত্র-মূল্যবোধ কোনওটাই আজও অর্জন করতে পারিনি। তবু মানুষ যতটুকু আজ হতে পেরেছি, তা এই মানুষটার সংস্পর্শ পেয়েছি বলে। আমার জীবনে এর চেয়েও উন্নত মানুষ আমি আর দেখিনি।

অনীক ধর ঃ হায়দার ভাই, আপনাকে একদিন কথা দিয়েছিলাম শেষ পর্যন্ত লড়ব। রাখিনি। হায়দার ভাই আপনার কাছে ক্ষমা চাই। যেটুকু গড়ে দিয়েছিলেন ভেতরে, মননে সেটা এখনও মানুষ করে রেখেছে আমাকে।

ফেসবুক ছদ্মনাম আনসার্টেনটি প্রিন্সিপল ঃ একবার প্রশ্ন করলাম বিপ্লবী মানুষের জীবনে প্রেম ভালবাসার ভূমিকা কী? তিনি স্বভাবসুলভ ভাবে বলেছিলেন, এই ছেলে বলে কী গো? ভালবাসা হল বিপ্লবের এনার্জি। বিপ্লব করতে এনার্জি লাগবে না? মানুষের প্রতি ভালবাসা না থাকলে তুমি কেন বিপ্লব করবে? কেন ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবে? ... ভালবাসা ব্যাপারটাকে ব্যক্তির আবেগ অনুভূতি হিসাবে বুঝতাম আগে, কিন্তু হায়দার ভাইয়ের আলোচনার পর থেকে টের পেলাম ভালবাসা অনেক বড় একটা শক্তি, ভালবাসাকে মানুষের কল্যাণের অনুকূলে নতুনভাবে আবিষ্কার করলাম আমি। ভালবাসা সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গিটাই আমূল পাল্টে দিল হায়দার ভাই। ... একদিন সঙ্গীত নিয়েই শুধু আলোচনা হল। সঙ্গীত নিয়ে এত কথা থাকতে পারে, সঙ্গীতের সুর আর লিরিক্স নিয়ে এত যৌক্তিক আলোচনা হতে পারে আমার ধারণা ছিল না।

আটের পাতায় দেখুন

“ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে, মোদের ততই বাঁধন টুটবে”

বাঁকুড়া জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর ১১ ছাত্রছাত্রীকে সংবর্ধনা

২৮ জুলাই। কলেজ স্ট্রিট (বাঁদিকে)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ৩১ জুলাই

প্যারি কমিউনের দেড়শো বছর

আজ থেকে ১৫০ বছর আগে ১৮৭১ সালে প্যারি কমিউনের ঐতিহাসিক সংগ্রামে উত্তাল হয়েছিল ফ্রান্স তথা সমগ্র ইউরোপ। বুর্জোয়া শাসকদের ক্ষমতাচ্যুত করে ১৮ মার্চ বিপ্লবী কেন্দ্রীয় কমিটি প্যারিসের ক্ষমতা দখল করে শ্রমিক শ্রেণির রাষ্ট্র কমিউন প্রতিষ্ঠা করেছিল। কমিউন গুণগত ভাবে ছিল বুর্জোয়া রাষ্ট্রের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। কমিউন শাসনে সেই প্রথম শ্রমিকরা মুক্তির স্বাদ পেয়েছিল।

নানা কারণে কমিউনকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। ৭২ দিন পর ২৮ মে বুর্জোয়া সরকার অপরিসীম বর্বরতায় নির্বিচার হত্যাকাণ্ড চালিয়ে কমিউনকে ধ্বংস করে। বিচারের নামে প্রহসন ঘটিয়ে হাজার হাজার কমিউনার্ডকে হত্যা করে বুর্জোয়ারা বিপ্লব দমন করে। এই লড়াইকে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করে মানবমুক্তির দিশারী কার্ল মার্ক্স তাঁর চিন্তাধারাকে আরও ক্ষুরধার করেন, সমৃদ্ধ করেন। শ্রমিক বিপ্লবের প্রচলিত ভ্রান্ত তত্ত্বগুলিকে আদর্শগত সংগ্রামে পরাস্ত করে প্যারি কমিউনের লড়াই মার্কসবাদের অভ্রান্ত সত্যতাকে প্রতিষ্ঠা করে। কমিউনার্ডদের অসীম বীরত্ব ও জঙ্গি লড়াই সত্ত্বেও কমিউনের পতন দেখায়, শ্রমিকবিপ্লবের জন্য সঠিক বিপ্লবী তত্ত্ব ও সঠিক বিপ্লবী দলের নেতৃত্ব অবশ্যপ্রয়োজন। প্যারি কমিউনের এই মহান সংগ্রামের ইতিহাস জানা সমস্ত মার্কসবাদীর অবশ্য-কর্তব্য।

আগের ছ'টি কিস্তিতে নেপোলিয়ন সাম্রাজ্যের পতন, পুনরায় বুরবোঁ রাজতন্ত্রের ক্ষমতা দখল, ১৮৩০-এ জুলাই বিদ্রোহে অর্লিয়ানিস্ট বংশের লুই ফিলিপের ক্ষমতা দখল এবং ১৮৪৮-এ ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে অস্থায়ী সরকার গঠন ও বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, সংবিধান পরিষদ থেকে শ্রমিক প্রতিনিধিদের বিতাড়ন এবং ২২ জুন শ্রমিক শ্রেণির বিদ্রোহকে নৃশংস ভাবে দমনের মধ্যে দিয়ে বুর্জোয়াদের নিরঙ্কুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা, নেপোলিয়নের ক্ষমতা দখল ও সম্রাটতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, ফ্রান্স-প্রুশিয়ার যুদ্ধ, নেপোলিয়নের পতন, কমিউন প্রতিষ্ঠা ও বিপ্লবী ঘোষণাগুলির কথা আলোচিত হয়েছে। এ বার সপ্তম কিস্তি। — সম্পাদক, গণদাবী

৭

তিয়েরের বাহিনী যখন ন্যাশনাল গার্ডের কাছে পরাজিত হয়ে ভার্সাইয়ের দিকে পালিয়ে যাচ্ছিল, তখনই দরকার ছিল পিছনে তাড়া করে তাদের সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করা। ভার্সাই সরকারের সব মন্ত্রীদের গ্রেপ্তার করা। কিন্তু কমিউনের বিপ্লবী নেতাদের অব্যবস্থিতচিত্ততার দরুন তাঁরা দ্রুত কোনও সিদ্ধান্তই নিতে পারলেন না। দেখতে দেখতে মার্চ মাস কেটে গেল। তিয়ের তার ভেঙে পড়া বাহিনীকে গুছিয়ে নেওয়ার সময় পেয়ে গেল। তিয়েরের বাহিনী যখন প্যারি ছেড়ে চলে যায় তখন ছত্রভঙ্গ বাহিনীর মধ্যে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা। অথচ তিয়েরের এই দুরবস্থার সুযোগ কমিউনের নেতারা নিতে পারলেন না।

কমিউনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ব্রুনেল দ্রুত ভার্সাই অভিযানের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। আর এক সদস্য রিগঁ-ও একই মত দিয়েছিলেন। লুইজ মিশেল চেয়েছিলেন ১৮ মার্চ রাতেই ভার্সাইয়ের দিকে মার্চ করে ভার্সাই সরকারকে বন্দি করে আনা হোক।

কিন্তু কমিউন ভার্সাই আক্রমণ করেনি। প্রথম থেকেই কমিউনের লড়াই ছিল আত্মরক্ষামূলক এবং কোনও ক্ষেত্রেই তা আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠেনি। লেনিনের মতে, কমিউনের পরাজয়ের এটা একটা কারণ।

২ এপ্রিল তিয়ের সরকার প্যারি কমিউনের উপর আক্রমণ শুরু করে দেয়। প্রায় বিনা যুদ্ধে দখল করে নেয় নিউলির গুরুত্বপূর্ণ একটি সেতু। ৩ এপ্রিল দ্যুভাল ভার্সাই বাহিনীর পাল্টা আক্রমণে তাঁর বাহিনী নিয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। বাহিনীর মধ্যে যাদের পরনে সামরিক পোশাক ছিল তাদের সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে মারা হয়। ভার্সাই নিয়ে যাওয়ার পথে ভিনয়ের নির্দেশে দ্যুভাল এবং তার দুই সঙ্গীকে গুলি করে মারা হয়। মঁভালেরিয়া দুর্গ রক্ষা করতে গিয়ে বাহিনীর একজন প্রথম সারির নেতা ফ্লুঁরা ভার্সাই বাহিনীর গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন।

এই বিপর্যয়ের জন্য কমিউন নেতারা অসি, লুলিয়ে ও ব্যজেরে এই তিন নেতাকে জেলে পুরে দেয়। ফলে কমিউনের সেনাবাহিনীর পরিচালনব্যবস্থায় এক শূন্যতা তৈরি হয়।

দ্বিতীয় বারের জন্য প্যারি অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। সমস্ত ফটক বন্ধ। চলতে থাকে ভার্সাই সেনার অবিচ্ছিন্ন গোলাবর্ষণ। অন্য দিকে তিয়ের সরকার বিসমার্কের কাছে বন্দি ফরাসি সেনাদের মুক্তির আবেদন জানায় যাতে ভার্সাই বাহিনীকে আরও সংখ্যাগরিষ্ঠ আরও মজবুত করে তোলা যায়। বিসমার্ক প্রথমে রাজি না হলেও, কমিউনের প্রভাব তাঁর ঘরের শত্রু জার্মান সমাজতন্ত্রীদের উদ্দীপিত করবে, এই আশঙ্কায় প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান। মুক্তি পেয়ে এক লক্ষ সত্তর হাজার বন্দি ভার্সাই বাহিনীর শক্তি বিপুল বাড়িয়ে দেয়। অন্য দিকে কমিউনের ন্যাশনাল গার্ডের সংখ্যা দু-লক্ষ হলে তার মধ্যে প্রকৃত যোদ্ধার সংখ্যা ছিল হাজার চল্লিশের মতো।

ন্যাশনাল গার্ড ছিল পুরনো জ্যাকোবিন ভাবধারায় প্রভাবিত। তাদের অনেক নেতাই মনে করত, শুধু সংখ্যাধিক্যের জোরেই যুদ্ধে জেতা সম্ভব, কোনও সামরিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই। আধুনিক যুদ্ধে জয়লাভের জন্য যে রসদ, যোগাযোগ, অ্যাম্বুলেন্স বাহিনী, ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ ইত্যাদি সব মিলিয়ে এক সুসংবদ্ধ জটিল সংগঠনের দরকার, এ বিষয়ে রক্ষী-বাহিনীর সাধারণ সৈনিক বা কমিউনের নেতাদের কারও স্বচ্ছ ধারণা ছিল না। আরও মুশকিল ছিল, রক্ষী বাহিনীর উপর নির্দেশ আসত একই সঙ্গে কমিউনের সদর দপ্তর, কেন্দ্রীয় কমিটি এবং মহল্লা কমিটি থেকে এবং অনেক সময়ই সেগুলি হত পরস্পরবিরোধী।

ভার্সাই বাহিনীর আক্রমণের চাপ যত বাড়তে থাকে ততই কমিউনের অভ্যন্তরে বিরোধের তীব্রতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই সব লক্ষ করে মার্ক্স কমিউনে আন্তর্জাতিকের দুই সদস্য ভারলাঁ্যা ও ফ্রাঙ্কেলকে লেখেন ঃ কমিউন যেন মনে হয়, অকিঞ্চিৎকর বিষয় এবং ব্যক্তিগত কলহ নিয়ে সময় নষ্ট করছে। ... এতেও কিছু আসত যেত না যদি আপনাদের হাতে যথেষ্ট সময় থাকত। মনে হয়, আপনারা অনেক সময় অযথা নষ্ট করে ফেলছেন।

৯ এপ্রিল ইসি দুর্গ গোলাবর্ষণে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল। ১৪ই গেল ভাঁভ দুর্গ। ২১-এ ভার্সাই বাহিনী প্যারি নগরীর ভেতরে ঢুকে পড়ল। কাজকর্মে কিছুটা শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে ২১-এ কমিউনের কর্মপরিষদের জায়গায় নটি কমিশনের প্রতিনিধিদের নিয়ে যুদ্ধকালীন ক্যাবিনেট গঠিত হল। কিন্তু নিজেদের মধ্যে বিরোধ বাড়তেই থাকল।

উত্তর ও পূর্ব দিকের দুর্গগুলি দখলে ছিল প্রুশীয়দের। তারা ভার্সাই সেনাদের নগরীর উত্তর দিকের এলাকার ভিতর দিয়ে পেরিয়ে যেতে দিল। অথচ যুদ্ধবিরতি চুক্তি অনুযায়ী সে এলাকাতে ঢোকা ভার্সাই সেনাদের পক্ষে ছিল নিষিদ্ধ। এ দিকটির সুরক্ষায় কমিউনার্ডরা জোর দেয়নি। তারা ধরেই নিয়েছিল এ দিকটি যুদ্ধবিরতির শর্তে সুরক্ষিত। কিন্তু ভার্সাই ফৌজ যতই এগোতে থাকে নগরীর পূর্ব দিকে— এই অংশটি আসল শ্রমিক নগরী— ততই ফৌজকে প্রবল প্রতিরোধের মুখে পড়তে হয়।

গোটা কমিউন নেমে পড়ে রাস্তায়। সর্বত্র ব্যারিকেড তৈরি করে নারী-পুরুষ, প্যারির সাধারণ মানুষ প্রাণপণ লড়াই চালাতে থাকে। ব্যারিকেড গড়ে ওঠে ফবুর্গ-মঁমাত্রে, বাস্তিলে, বেলফিলে, বুলেভারে, ভল্টেয়ারে, পর্ত সাঁদানিতে। সবর্ত্র ব্যারিকেড তৈরিতে হাত লাগান মেয়েরা। অসমসাহসী লড়াই চালান কমিউনার্ডরা। গোটা প্যারি দখল করার জন্য ভার্সাই সেনাপতি ক্লিশঁ ভেবেছিলেন তিন দিনই যথেষ্ট। কিন্তু তাঁর হিসেবে ভুল ছিল। লড়াই চলে আট দিন ধরে। শেষ হয় রবিবার ২৮ মে, কমিউনের পতনের মাধ্যমে। কমিউনের প্রতিটি কর্মী শেষ দিন পর্যন্ত তীব্র বীরত্বপূর্ণ লড়াই চালিয়ে গেছেন। নেতৃবৃন্দের প্রায় প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেছেন এবং একের পর এক প্রাণ দিয়েছেন, কিন্তু কেউ আত্মসমর্পণ করেননি। এ লড়াইয়ে মহিলারা গৌরবময় ভূমিকা পালন করেছেন। শুধু মহিলারাই নন, ছোট ছোট ছেলেমেয়ের অপূর্ব বীরত্বের কাহিনীও মিশে আছে এ-লড়াইয়ের সঙ্গে। শেষের দিকে লড়াই চলে প্রতিটি রাস্তায়। যে বর্বর অত্যাচারের ইতিহাস সরকারি সেনাদল সেদিন তৈরি করে তা নিঃসন্দেহে ইতিহাসের পাতায় বিরল নয়। যুগে যুগে এমন নির্মম অমানবিকতায় প্রতিক্রিয়াশীলরা বিপ্লবের কণ্ঠরোধ করেছে।

২৮ মে রবিবার কমিউনের শেষ দিনটি ঘনিয়ে আসে। রাস্তায় রাস্তায় গড়ে তোলা সমস্ত ব্যারিকেডই প্রায় স্তব্ধ হয়ে আসে। অবশেষে এক সময় শেষ ব্যারিকেডও স্তব্ধ হয়ে যায়। তারপর অসহায় পুরুষ, নারী আর শিশু হত্যার যে হিড়িক এক সপ্তাহ ধরে ক্রমবর্ধমান হারে চলেছিল, তা ওঠে চরমে। নির্বিচারে গুলি চালিয়ে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়। পের লাসেজ কবরস্থানের 'কমিউনার্ডদের প্রাচীরের' সামনে এই গণহত্যার শেষ অনুষ্ঠান হয়। তারপর যখন দেখা গেল সকলকে হত্যা করা অসম্ভব তখন শুরু হয় পাইকারি ভাবে গ্রেফতার, বাছাই করা লোকদের গুলি করে হত্যা, অবশিষ্টদের বড় বড় বন্দিশিবিরে পাঠানো হয়, যেখানে তারা প্রতীক্ষায় থাকে সামরিক আদালতে বিচারের জন্য।

দশ দিনে প্রায় তিরিশ হাজার নরনারী ও শিশু মারা গেছে এ লড়াইয়ে। বন্দি পঁয়তাল্লিশ হাজার। লড়াই শেষ হওয়ার পরও দিন কয়েক চলেছিল ঘৃণ্য বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড। রাস্তার ওপরেই হত্যা করা হল কয়েকজন নেতাকে। এই জঘন্য হত্যাকাণ্ড যে কত ব্যাপকভাবে ঘটেছিল, তা তিয়েরের এক টেলিগ্রামের বয়ান থেকেই বোঝা যাবে — "রাস্তা ওদের মৃতদেহে ভরে গিয়েছে। এই বীভৎস দৃশ্য ওদের পক্ষে একটা শিক্ষার কাজ করবে।"

২৮ মে লেখক গঁকুর লিখেলেন, লাঁক্লাবুর্গ উদ্যানে কমিনার্ডদের ছজনের এক একটি দলকে গুলি করে মারা হত। কয়েকদিন ধরে সেই গুলির শব্দ প্যারির চারদিকে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। মাত্র দুদিনে দু-হাজার তিনশ কমিউনার্ডকে গুলি করে মারা হয়। ৩১ মে এমিল জোলা লিখছেন, আমি এইমাত্র প্যারি পরিক্রমা শেষ করলাম। কী ভয়ঙ্কর দৃশ্য! আমি শুধু ব্রিজের নীচে স্তূপীকৃত মৃতদেহের কথা বলছি। এই দৃশ্য কখনও ভুলব না। এ ভাবে রক্তাক্ত নরমাংসের স্তূপ ইতস্তত জড়ো করে রাখা হয়েছে।

এই নির্মম প্রতিহিংসালীলার যেন শেষ নেই। তিয়ের বাহিনীর হাতে কত প্রাণ বলি হল? কেউ জানে না তার সঠিক হিসেব। সরকারি সূত্রে জানা যায়, প্যারির পৌরসভা সতেরো হাজার ব্যক্তিকে সমাহিত করার খরচ বহন করেছে। ফরাসি ইতিহাসবিদদের হিসেবে সংখ্যাটি কুড়ি হাজার আর পঁচিশ হাজারের মাঝামাঝি।

ফ্রান্সের বাইরে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হল। লন্ডন শহরে এক প্রতিবাদ সভায় জন স্টুয়ার্ট মিল বক্তৃতা করলেন।

বুর্জোয়াদের এই নৃশংসতা দেখে এঙ্গেলস বললেন, নিজ স্বার্থ ও দাবি নিয়ে শ্রমিকেরা পৃথক শ্রেণি হিসাবে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো মাত্র বুর্জোয়ারা প্রতিহিংসার কী উন্মত্ত নিষ্ঠুরতায় ধাবিত হবে, এই প্রথম তারা তা দেখিয়ে দিল। (ক্রমশ)

প্রকাশিত হয়েছে

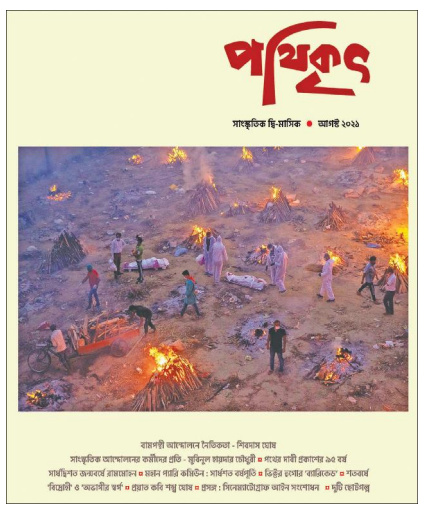

সংগ্রহ করুন

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর ভাষণ

তিনের পাতার পর

চাইছি না। দিল্লির ওই সভায় ঘেরাও আন্দোলন আলোচ্য বিষয় ছিল। চিত্ত রায় তখন অসুস্থ ছিলেন। ভূপেশ গুপ্ত ও রামমূর্তি তাঁদের অন্য কাজ থাকার জন্য যাননি। আমি সেখানে গেলাম। সেখানে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অ্যাডভোকেট সহ প্রায় ৫০ জন হাজির। তাঁরা ওই এম পি-দের আশায় অপেক্ষা করছিলেন। আমাকে দেখে তাঁরা বললেন, আপনি তো পশ্চিমবঙ্গের, ওখানে কী ঘটছে আপনার কাছ থেকে আমরা জানতে চাই। আপনারা জানেন, আমি ইংরেজিতে দক্ষ নই, তাই ভাঙা হিন্দি এবং ইংরেজিতে পশ্চিমবঙ্গের আন্দোলন কীভাবে গড়ে উঠল এবং কমরেড শিবদাস ঘোষ আইন ও নৈতিকতার প্রশ্নে কীভাবে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন, তা আমি বলি। এই সময়ে আপত্তি উঠেছিল যে, এই আন্দোলন আইনসঙ্গত নয়। কমরেড শিবদাস ঘোষ তার উত্তরে বলেছিলেন, যা আইনসঙ্গত, তা সবসময়ই ন্যায়সঙ্গত হবে তা নয়। আবার আইনের চোখে বেআইনি হলেও সেটা ন্যায়সঙ্গত হতে পারে। আমি এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করি, তাঁরা ভীষণভাবে প্রভাবিত হন। তাঁরা আমাকে বলেন, কমরেড আমরা আপনাকে এনেছি এবং অবশ্যই দিল্লি ফেরার ব্যবস্থা করব। কিন্তু আমাদের অনুরোধ এক রাত আমাদের সঙ্গে থাকুন। আমি এক রাত নয়, ওঁদের অনুরোধে সাত দিন সাত রাত ওখানে কাটালাম। যে পোশাকে গিয়েছিলাম সেটাই শুধু আমার ছিল। তাঁরা আমাকে জামাকাপড় ইত্যাদি পরতে দিলেন, আমার সাথে তাঁদের কথা হল। ১৫ দিন পর আবার সেখানে গেলাম। আবারও তাঁদের সাথে অনেক কথা হল, তাঁরা দারুণভাবে প্রভাবিত হলেন। আমি ঠিক করলাম এই যোগাযোগের কথা কমরেড শিবদাস ঘোষকে জানাতে হবে। আমি যখন টেলিফোনে তাঁকে জানালাম, তিনি বললেন তুমি যাও, যোগাযোগ রক্ষা কর, কেন্দ্রীয় কমিটির কোনও সদস্য যাবেন তাঁদের সাথে কথা বলতে। কমরেড প্রীতীশ চন্দকে সেখানে পাঠানো হয়েছিল। আমরা তিন দিন ধরে নানা বিষয়ে আলোচনা করলাম। আলোচনায় মূল বিষয় উঠল ভারতবর্ষের বিপ্লবের স্তর কী হবে— জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব না সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। যাঁরা সেখানে জড়ো হতেন, তাঁদের মধ্যে কিছু জন নকশাল আন্দোলনেও ঘোরাঘুরি করতেন। তাঁদের সিপিএম ছেড়ে নকশাল আন্দোলনে যোগদান করার ইচ্ছে ছিল। আমি তাঁদের সাথেও কথা বলি। দীর্ঘ কথাবার্তার পর সেই এগারো জন এগিয়ে আসেন এবং তাঁদের এস ইউ সি আই (সি) দলের অ্যাপ্লিক্যান্ট মেম্বারও করা হয়। একটি সাংগঠনিক কমিটি করা হয়।

দিল্লিতে কিছুদিন কমরেড শিবদাস ঘোষের সঙ্গে থাকার সুবাদে তাঁর অনেক মূল্যবান আলোচনা শুনি। বিশেষ কয়েকটি ঘটনা ভুলবার নয়। তিনি সব সময়ই, আমরা যারা তাঁর সাথে থাকতাম, আমাদের সামনে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। কমরেড চিত্ত রায়ের যে কোয়ার্টারে আমরা থাকতাম তার পাশের কোয়ার্টারে থাকতেন বিশিষ্ট আইনবিদ সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট ও রাজ্যসভার সদস্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত। তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় থেকেই কমরেড শিবদাস ঘোষকে জানতেন, একসাথে জেলেও ছিলেন। তিনি যে পাশের ঘর থেকে কমরেড শিবদাস ঘোষের আলোচনা শুনতেন এবং আকৃষ্ট হতেন তা আমরা জানতাম না। একদিন দেখলাম, তাঁর ঘরে বন্দর শ্রমিক নেতা মাখন চ্যাটার্জী, কুলকার্নি ও শিল্পপতি পিলু মোদি এসেছেন। দ্বিজেনবাবু এসে কমরেড শিবদাস ঘোষকে ডেকে নিয়ে গেলেন কারণ তাঁর ঘরে উপস্থিত ব্যক্তিরা মার্কসবাদের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। কমরেড শিবদাস ঘোষ যাওয়ার পর উপস্থিত ব্যক্তিরা তাঁকে বলেন, মার্কসবাদের আর কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই। কমরেড শিবদাস ঘোষ উত্তরে বলেন, মার্কসবাদ সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক দর্শন। কোনও বিজ্ঞান কি আজ পর্যন্ত প্রমাণ করতে পেরেছে যে মার্কসবাদ ভুল বা অপ্রাসঙ্গিক? এর পর তিনি মার্কসবাদ নিয়ে কিছু আলোচনা সেখানে করেন। ওঁরা সব চুপ হয়ে যান। দ্বিজেনবাবু এই আলোচনায় এতই মুগ্ধ হন যে, দিল্লিতে তাঁর অন্যান্য বিশিষ্ট পরিচিতদের সাথে কমরেড শিবদাস ঘোষের আলোচনার উদ্যোগ নিতে থাকেন। এঁদের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের এক বড় অ্যাডভোকেট ছিলেন, যাঁর নাম আজ আমার ঠিক মনে পড়ছে না। তিনি প্রায়ই আসতেন, নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। একদিন কথায় কথায় রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের প্রসঙ্গ ওঠে। সেই আলোচনায় কমরেড শিবদাস ঘোষ শরৎচন্দ্রের পথের দাবি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিঠির সমালোচনা করেন। এতে ওই অ্যাডভোকেট ভদ্রলোক অসন্তুষ্ট হন। কারণ তিনি প্রবল রবীন্দ্রভক্ত ছিলেন। কমরেড শিবদাস ঘোষ যখন আলোচনা করছিলেন তখন ওখানে উপস্থিত দু'জন কমরেড সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় ভাবে ওই আলোচনায় ঢুকে যায়। ফলে কমরেড শিবদাস ঘোষ তাঁর বক্তব্য সম্পূর্ণ বুঝিয়ে উঠতে পারেননি। ফলে ওই ভদ্রলোক রেগে চলে যান। লক্ষ করলাম, কমরেড শিবদাস ঘোষ ওই দুই কমরেডকে কিছু বললেন না কিন্তু নিজে তিনি খুব অস্থির হয়ে যান ওই ভদ্রলোককে সত্যটা বোঝাতে না পারার জন্য। এর আগেও দেখেছি, কমরেড শিবদাস ঘোষ যখন যাকে যে সত্য বোঝাতে চাইতেন, যতক্ষণ সে বুঝতে না পারত ততক্ষণ খাওয়া দাওয়া পর্যন্ত বন্ধ রেখে আলোচনা করে যেতেন।

সে যাই হোক, দিল্লি থেকে কলকাতায় ফিরে যাওয়ার সময় এগিয়ে আসছিল। সে সময় একদিন লক্ষ করলাম, ওই অ্যাডভোকেট ভদ্রলোক আমাদের কোয়ার্টারের সামনে রাস্তায় পায়চারি করছেন। মনে হল, আসতে চাইছেন কিন্তু ইতস্তত করছেন। আমি কমরেড ঘোষকে বিষয়টা জানালাম। তিনি বললেন, ডেকে নিয়ে এসো। তাঁকে ডাকতেই তিনি চলে এলেন এবং ঘরে ঢুকেই কমরেড ঘোষের দু'হাত ধরে বললেন, আমার সেদিনের আচরণের জন্য আমায় ক্ষমা করবেন। আপনার মতো এমন জ্ঞানী মানুষ আমি কখনও দেখিনি। এরপর থেকে ওই ভদ্রলোক আমাদের পার্টির কাগজপত্র পড়তেন, চাঁদাও দিতেন।

আর একটি ঘটনাও আমার মনে দাগ কেটে আছে। আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কাছে কমরেড শিবদাস ঘোষের কথা শুনে অঙ্কে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট একজন ছাত্র কোয়ার্টারে এসে দেখা করে প্রশ্ন করেন, অঙ্কশাস্ত্রের সাথে ডায়ালেকটিক্সের কী সম্বন্ধআছে? কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রাঞ্জল ভাবে তাকে সেটা বুঝিয়ে দেন। এর দ্বারা সেই ছাত্রটি এতই আকৃষ্ট হয় যে দলের সাথে কাজে যুক্ত হয়ে যায় এবং কিছুদিন আমার কাজের সাথে ছিল।

এরপর হরিয়ানাতেও যাই, পার্টির কাজ শুরু হয়। কমরেড সত্যবান এই সময়ে পার্টিতে আসেন। বর্তমানে তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখন গোটা হরিয়ানা জুড়ে এস ইউ সি আই (সি) পার্টির সংগঠন আছে। আমি চলে আসার পর ওখানে পার্টির আরও বিস্তৃতি হয়।

১৯৭১ এবং ১৯৭২ সালে পশ্চিমবঙ্গে পর পর দু'টি বিধানসভা নির্বাচন হয়, আমি সেই কাজে অংশগ্রহণ করি। ঘটনাচক্রে সেই সময়েই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ গড়ে ওঠে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের উপর কমরেড শিবদাস ঘোষের খুবই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আছে। তিনি ভারতীয় জনগণকে সচেতন করেন যে এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বাধীনতা আন্দোলন। এই আন্দোলন সম্পর্কে ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণি ও জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি এক হতে পারে না। রাজনৈতিক মহলে এই আন্দোলন নিয়ে নানা রকম মতামত ঘোরাফেরা করতে থাকে। কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছিলেন, ভারতের কংগ্রেস সরকার ভারতের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে আধিপত্য বিস্তার করতে পাকিস্তানের বিভাজন চাইছিল। এই সংগ্রামে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। এই সময়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাকে বলেন, তুমি অনেক দিন বাংলাদেশে তোমাদের বাড়িতে যাওনি। তুমি তো কিছু বইপত্র নিয়ে ওই দেশের নানা শক্তির সাথে দেখাসাক্ষাৎ করতে পার। তাঁর কথায় তিনদিন পরে বাংলাদেশের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ি। আমি তখন বাংলাদেশের প্রায় কিছুই জানি না। অতি শৈশবে আমি সেখান থেকে চলে আসি, তার পর আর কখনও বাংলাদেশে যাইনি।

বাংলাদেশ একটু ভিন্ন ধরনের দেশ। ভারতে মানুষের সাহায্য পাওয়া অনেক কঠিন। সে তুলনায় বাংলাদেশের মাটি খুব নরম। বেশ কিছু খুবই দয়ালু মানুষের সঙ্গে আমার সেখানে দেখা হয়েছে। না না, আমি ভারতের মানুষের দোষ দিচ্ছি না। বাংলাদেশের মানুষের কাছে আমি ভারতের মানুষের মহত্ত্বের কথা বলি। তবুও বলব, বাংলাদেশ খুবই নরম মাটির জায়গা ছিল। তাঁরা আমাকে প্রভূত সাহায্য দিয়েছেন। আমি যখন সেখানে ছিলাম, তখন সেখানে ছাত্র লিগ নামে ছাত্রদের একটি সংগঠন ছিল। বাস্তবে তা ছিল মুসলিম লিগেরই ধারা। আগে এদের মুসলিম স্টুডেন্টস লিগ বলা হত। তারপর নাম বদলে ছাত্র লিগ বলা হয়। মওলানা ভাসানি আওয়ামি লিগ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে আওয়ামি মুসলিম লিগ ছিল, তারপর তিনি শুধু আওয়ামি লিগ নাম দেন। কিন্তু সেখ মুজিবর এবং সোহরাবর্দী আদ্যোপান্ত সাম্প্রদায়িক ছিলেন। ১৯৪৬-এর রায়টের সাথে তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। সোহরাবর্দী সেখ মুজিবের নেতা এবং শিক্ষক ছিলেন। আপনারা মুজিব সম্বন্ধে জানেন। আন্দোলনের উত্তাল সময়ে তিনি সেকুলারিজম, ন্যাশনালিজম, সোস্যালিজম এবং গণতন্ত্র এই সব বলতে বাধ্য হন। স্বাধীনতা আন্দোলনে হিন্দু এবং মুসলিম জনগণের ঐক্য তাঁকে সেক্যুলারিজমের স্লোগান তুলতে বাধ্য করে। এই ধরনের স্লোগান তখন অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু তিনি আদতে সেক্যুলার ছিলেন না। কমরেড শিবদাস ঘোষ তাঁর ২৪ এপ্রিল ১৯৭১ সালের বক্তব্যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একে পাকিস্তানের গর্ভে জাত বাংলাদেশ ন্যাশনালিজম বলে অভিহিত করেন। যদিও তারা পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন। বাংলাদেশে যাবার পর আমি ছাত্র লিগের নেতাদের সাথে দেখা করি। তারা তখন বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের সাধারণ প্রভাবে শ্রেণি সংগ্রাম, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র এবং সমাজ বিপ্লবের স্লোগান তুলছিল। কিন্তু তারা আওয়ামি লিগের ছাত্র সংগঠন হিসাবে তাদের সাথেই ছিল। আসলে তারা তখন ছিল পেটিবুর্জোয়া বিপ্লবী শক্তি, সাম্রাজ্যবাদ এবং সমস্ত রকম প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামী। তখন এটাই ছিল অগ্রগণ্য গণতান্ত্রিক শক্তি। আমি বাংলাদেশে মুজিব মেকার হিসাবে খ্যাত সিরাজুল আলম খানের সাথে দেখা করি। তিনিই মুজিবকে বঙ্গবন্ধু খেতাব দেন। সেই বঙ্গবন্ধুর কন্যা অবশ্য এখন বাংলাদেশকে নৃশংসভাবে শাসন করছেন, সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকারকে হত্যা করছেন। আমি তখন সিরাজুল আলম খানকে বলি, আপনি সমাজতন্ত্রের কথা বলছেন, কিন্তু একটি প্রকৃত বিপ্লবী দল ছাড়া কেমন করে সমাজতন্ত্র আসবে? আমি তাঁদের এই মতবাদ বোঝানোর চেষ্টা করি এবং তাঁরা একমত হন যে অবশ্যই একটি বিপ্লবী পার্টি থাকা প্রয়োজন। তখন তিনি কমিউনিস্ট কোঅর্ডিনেশন কমিটি নামে একটি বিপ্লবী কোর গড়ে তোলার চেষ্টা শুরু করেন। এই মানুষ কমরেড শিবদাস ঘোষের বক্তব্যে আকৃষ্ট হয়ে তিনবার কলকাতায় এসে কমরেড শিবদাস ঘোষের সাথে মিলিত হন। কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাকে বলেন যে সিরাজুল আলম খান একজন স্বপ্নদ্রষ্টা এবং ভালো সংগঠকও। কিন্তু তাঁর তত্ত্বগত জ্ঞান এত দুর্বল যে তিনি আন্দোলন পরিচালনা করলে অনেক ভুলভ্রান্তি ঘটবে। এটা বাস্তবে ঘটেছেও। তিনি সত্যিই অনেক ভুল করেন। সিরাজুল আলম খানের অনুরোধ অনুযায়ী কমরেড শিবদাস ঘোষ বাংলাদেশের জন্য একটি থিসিস তৈরি করিয়ে দেন। আমি সেটা নিয়ে যাই এবং তা গৃহীত হয়। একটি সমস্যা আমি সর্বদা বাংলাদেশে লক্ষ করি। কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তা তাঁদের চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে। যাঁরা অনেকেই পরিচিত নেতা, ছাত্র এবং আওয়ামি লিগেরও নেতা, তাঁরা আমার আহ্বানে সাড়া দেন। কিন্তু যখনই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা অনুযায়ী জীবনের সর্বদিক ব্যাপ্ত করে সংগ্রামের প্রশ্ন আসে, তখন তাঁরা নানা অজুহাত তুলে বা যুক্তি খাড়া করে পিছিয়ে যান। তাঁরা তত্ত্ব বা যুক্তি স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করেন, কিন্তু তা জীবনে প্রয়োগ করতে গিয়ে পিছিয়ে আসেন।

আমাদের সাথে প্রথম যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা বেশ কিছু ছিলেন উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণির। আমি তাঁদের বললাম, আমাদের একটা সর্বহারা শ্রেণির পার্টি গঠন করতে হলে শোষিত মানুষের সংস্পর্শে থাকতে হবে। সেই সময়ে আমার আস্তানা ছিল এক বিরাট বস্তিতে। হাজার লোক সেখানে থাকতেন, শুধু একটা শৌচাগার ছিল। শোষিত নিপীড়িত মানুষেরাই অগ্রগণ্য বিপ্লবী শক্তি হয়। তাদের সংগঠিত করার জন্য আমাদের তাঁদের নিকটে থাকতে হবে। তখন অন্যরা আমার কথা মানতে পারেননি। একজন বললেন আমি ঢাকা

সাতের পাতায় দেখুন

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর ভাষণ

ছয়ের পাতার পর

বিশ্ববিদালয়ের ছাত্র সংসদের সভাপতি, সারা দেশে সকলেই আমাকে জানে। আমি কেন বস্তিবাসীদের মধ্যে জীবন কাটাতে যাব। বুঝিয়ে বললাম, যদিও আপনি একজন প্রখ্যাত ছাত্রনেতা, কিন্তু আপনি বিপ্লবী ও আপনি একটা বিপ্লবী পার্টির জন্য কাজ করছেন। সুতরাং আপনার সেখানে যাওয়া উচিত। এভাবে অনেক মানুষ সেই সময়ে কমরেড শিবদাস ঘোষের যুক্তি এবং মিলিট্যান্ট বক্তব্যের আকর্ষণে এগিয়ে এসেছিল, কারণ তাঁর চিন্তার এক আলাদা রকমের আকর্ষণ আছে। কিন্তু জীবনে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রেই যত সমস্যা দেখা দেয়। এই সমস্যা সব পার্টিরই আছে, আপনাদের পার্টির মধ্যেও আছে। এই চরিত্র গঠন করার মানে, একজন বিপ্লবী যে মুমূর্ষু সমাজে বাস করছে, তার বিরুদ্ধে তাকে রিভোল্ট করতে হবে। প্রতিটি সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে সর্বদা সে একজন বিপ্লবী। সব ধরনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিপ্লবী আদর্শই তার কাছে মুখ্য। এই আদর্শ সর্বদা বাংলাদেশে প্রচার করি।

আমি আপনাদের বলি, এক সময়ে বাংলাদেশে আমি গভীর সঙ্কটে পড়েছিলাম। সেই সময়ে আমার জীবন সংশয়ের মধ্যে পড়েছিল। কর্নেল তাহেরের মামলায় আমার নামও যুক্ত হয়ে যায়। তাহেরকে জিয়াউর রহমান ফাঁসি দেন। জিয়াউর রহমান ছিলেন মিলিটারির সর্বাধিনায়ক, আবার বিএনপি-রও নেতা। অনেককে কারাগারে বন্দি করেন। অনেকে আমাকে সর্তক করে বলেন, হায়দার ভাই আপনি অবশ্যই ভারতে চলে যান, এখানে থাকা বিপজ্জনক। আমি তখন বিপদগ্রস্ত। ইতিমধ্যে কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রয়াত হন, আমি জানতাম না। কমরেড নীহার মুখার্জী দু'জন কমরেডকে পাঠান আমাকে জানাবার জন্য। তাঁরা আমার সন্ধান পাননি। আমি নিরাপত্তার জন্য সারা বাংলাদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি। খুব ঝুঁকি নিয়ে কোনও রকমে আমি উত্তরবঙ্গে ঢুকলাম। কমরেড শিবদাস ঘোষ তার এক মাস আগে আমাদের ছেড়ে গেছেন। আমি এই সংবাদে প্রচণ্ড ভেঙে পড়লাম। কমরেড নীহার মুখার্জী আমাকে সাহচর্য ও সান্ত্বনা দিলেন। আমি ১৯৭৬-এর সেপ্টেম্বরে এসেছিলাম। ১৯৭৭-এ বাংলাদেশে আমার যোগাযোগের লোকজন আমাকে বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার জন্য বলতে লাগলেন। আমি কমরেড নীহার মুখার্জীকে বললাম আমার এখন বাংলাদেশে ফিরে যাওয়া উচিত। তিনি বললেন, সিদ্ধান্ত আপনি করুন। আমি যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। তখন থেকে আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করে যাচ্ছি।

ওদেশে যাঁরা বিপ্লবী তত্ত্ব জীবনে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে পিছিয়ে গেলেন, আমি তাঁদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল গঠন করি। যখন আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক শিবির ভেঙে পড়েছে, কেন সংশোধনবাদ জন্ম নিল, কী ভাবে তা প্রতিবিপ্লবের জমি তৈরি করে দিল, কী ভাবে সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে, সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় সত্ত্বেও কেন সমাজতন্ত্রই একমাত্র মুক্তির পথ এগুলি আমি তুলে ধরি। কমরেড শিবদাস ঘোষের এইসব শিক্ষা, মার্কসবাদ সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ, কমিউনিস্ট নীতি-নৈতিকতা সম্পর্কে তাঁর আলোচনা, বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের এই সংকটময় পরিস্থিতিতেও বাংলাদেশের বহু ছাত্র-যুবককে আকর্ষণ করে। বহু সংখ্যায় যুবক-যুবতী আমাদের সাথে যুক্ত হয়। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ভেঙে তিন ভাগ হয়ে যায়। অনেকেই বলতে থাকে কমিউনিজমের আর কোনও ভবিষ্যৎ নেই। সারা দুনিয়ার কমিউনিস্টরা যখন মুহ্যমান, তখন বাংলাদেশে আমাদের পার্টিকেই খুব শক্তিশালী মনে হচ্ছিল, খুবই সংগঠিত এবং প্রকৃত কমিউনিস্ট শক্তি হিসাবে প্রতিভাত হচ্ছিল। অনেক পুরনো কমিউনিস্ট পার্টির নেতা, যাঁরা সৎ, তাঁরা চিন্তা করেন কেমন করে আমরা ছেলেমেয়েদের জোটাচ্ছি। তাঁরা মনে করেন যখন নতুনদের আকর্ষণ করার মতো তাঁদের কোনও যুক্তি-নীতি কাজ করছে না, তখন আমরা কেমন করে সফল হচ্ছি। একজন প্রবীণ নেতা মনজুল হাসান খান একদিন আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করেন, হায়দার ভাই, আপনি কেমন করে এবং কী শিক্ষা দেন যে এই সমস্ত ছাত্র-যুবকরা আপনাদের সাথে আসছে? আমি তাঁকে বলি, এটা কমরেড শিবদাস ঘোষের আদর্শ ছাড়া অন্য কিছু নয়। কেমন করে তিনি সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন, কেমন করে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, আজকের দিনে কী ভাবে একটি কমিউনিস্ট দল গড়ে তুলতে হবে, উন্নত কমিউনিস্টচরিত্র কী হবে— এ সব কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা তাঁকে বলি। এভাবে আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের সামনে তিনি যে এক নতুন দিশা তুলে ধরেছেন, এ সবই যে আমাদের শক্তির উৎস, তাঁকে জানাই। তিনি দুঃখ করে বলেন, আমরাও কখনও কখনও কিছু যুবশক্তিকে জড়ো করি, কিন্তু কিছুদিন পরে তারা আর আমাদের সাথে থাকে না।

কিন্তু এই পার্টিতেও সেই পুরনো সমস্যাই থেকে গেল। এখানেও জীবনের সর্বদিক পরিব্যাপ্ত করে সংগ্রামের প্র্যাক্টিস অনেকেই করতে পারেননি। প্রাথমিকে তাঁরা কিছু দিন সংগ্রাম শুরু করেন, তারপরে তাঁরা প্র্যাক্টিসের রাস্তা পরিত্যাগ করেন। শেষপর্যন্ত একদল কমরেড শিবদাস ঘোষকে অথরিটি হিসাবে মানতে অস্বীকার করেন। পার্টি আবার ভাগ হয়। আমরা বাসদ (মার্কসবাদী) পার্টি গড়ে তুলি। আমাদের নতুন পার্টি বাসদ (মার্কসবাদী) গঠনেও এই সমস্যা আছে। তবে আমরা সংগ্রাম চালাচ্ছি। আশা করছি, একদল দাঁড়িয়ে যাবে।

আমি অন্তত ১২ বার ইউরোপে গেছি এবং সেখানে অনেক দলের অনেক নেতার সাথে দেখাসাক্ষাৎ করেছি। আমি দেখেছি তাঁরা সকলেই হতাশ। তাঁদের কেউ কেউ ম্যান অফ ইন্টিগ্রিটি, তাঁরা কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু তাঁরা কোনও রাস্তা খুঁজে পাচ্ছেন না। আমি তাঁদের কাছে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার অনেক কিছু ব্যাখ্যা করেছি। একজন 'হোয়াই এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) ইজ দি অনলি কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া' অনুবাদ করতে শুরু করেন। এটা একটা নতুন জিনিস। যৌথজীবন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাঁদের অকৃতকার্যতার কারণ এখানেই। ইউরোপ নিয়ে গর্ববোধ এবং প্রাচ্যের দেশগুলির প্রতি তাঁদের অবজ্ঞা, তাঁদের মধ্যে একটা বাধা হিসাবে কাজ করে আমাদের উন্নত চিন্তা, উন্নত সংস্কৃতিকে গ্রহণের ক্ষেত্রে। তাঁরা খুব ব্যক্তিকেন্দ্রিক। আমি একবার বার্লিন থেকে রোম যাচ্ছিলাম, তা অনেকটা পথ। ইডরোপের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত। ট্রেনে একটি লোক উঠে আমাকে দেখল। তারপর সে একটা পেপার বা বই বের করে বসে পড়ল। তাতেই সে নিমগ্ন। সে কথা বলবে না। ট্রেনে কোনও কথাই নেই। লম্বা ভ্রমণ, কিন্তু ট্রেনে যাত্রীদের মধ্যে কোনও কথা নেই। আমি এ ব্যাপারে জার্মানির এক কমরেড মিচেল ওপারস্কালস্কিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। প্রশ্ন শুনে হেসে বললেন, তুমি জান না কেন এরকম, কারণ, এরা চূড়ান্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক, এরা জানেই না পরস্পরের সঙ্গে কী ভাবে কথা বলতে হয়। এটা ভাষার সমস্যা নয়, এটা তাদের সংস্কৃতির প্রশ্ন। যদি কাউকে জিজ্ঞেস করা হয়, আপনি কেমন আছেন? সে রেগে গিয়ে উত্তর দেয়— আমি খুব ভাল আছি, তুমি কেন জিজ্ঞেস করছ? যদি জিজ্ঞেস করেন তোমার বাবার নাম কি? সে বলবে তুমি আমার বাবার কথা জিজ্ঞেস করছ কেন? তুমি তো আমার সাথে কথা বলছ, তুমি আমার বাবার সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে পার না। এ ধরনের ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা সেখানে, প্রতিটি মানুষই পৃথক। নেদারল্যান্ডের কমরেড ভ্যান্ডারক্লিফ্‌ট একজন সহৃদয় মানুষ। তিনি ১৮ নং মোস্টারহার্টে বাস করেন। তাঁর একটি মাত্র কন্যা। সে তাঁর কাছাকাছি অন্য একটা বাড়িতে থাকে। এতেই তাঁর পার্টির কমরেডরা তাঁকে প্রশ্ন করে তোমার মেয়ে তোমার নিকটে আছে কেন, এখানে কেন সে? এর মানে হল, প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ে বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরে বাবা-মার কাছে থাকতে পারে না। তাদের আলাদা পরিবারে থাকা আবশ্যক। এই রকমের ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধারা চলছে ইউরোপে। মানুষ চূড়ান্ত ব্যক্তিবাদী। কেউ ধরুন রাস্তায় কাঁদছে, আমি তাকে সান্ত্বনা দিতে গেলাম, আমার সাথে থাকা কমরেডরা আমাকে নিষেধ করলেন, না, না, সে রেগে যাবে। সে আপনাকে বলবে আমাকে একা থাকতে দিন। এটা আমার বিষয়। আপনি আমাকে সান্ত্বনা দেবেন না। এ এক সমস্যা। কমরেড আমার সামান্য ইংরেজি বিদ্যায় আমি চেষ্টা করছি আপনাদের কাছে আমার কথা বলতে।

বাংলাদেশে আমাদের পার্টি আবার ২০১৩ সালে বিভক্ত হয়। আমাদের নতুন পার্টি বাসদ (মার্কসবাদী) অনেক অসুবিধার মধ্যে গড়ে উঠেছে। আসলে পুরনো পার্টির পুরনো অভ্যাস আমাদের সামনে বাধা। পুরনো অনেক কিছুই তারা এখনও বহন করছে। তবে একটা জিনিস তারা বুঝতে পারছে, আগের পার্টির অপর অংশ কোনও একটা পার্টিই নয়। তত্ত্বগতভাবে তারা তা বুঝছে। কিন্তু অভ্যাস, কালচার, স্নেহ-ভালবাসা যা যে কোনও মানুষের সামগ্রিক জীবনের অংশ, তার মধ্যে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার বীজ আছে।

আমরা আপনাদের পার্টির থেকে অনেক সাহায্য পাচ্ছি। আপনারা একটা মহান পার্টি। এই পার্টি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে সব থেকে অগ্রণী, কারণ এই পার্টি কমরেড শিবদাস ঘোষের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এই পার্টির অফুরন্ত শক্তি আছে। আছে অসীম সম্ভাবনা। সারা ভারত জুড়ে পার্টি বিকশিত হচ্ছে। জনসাধারণের দৈনন্দিন প্রতিটি লড়াইয়ে তারা অংশগ্রহণ করছে, নেতৃত্ব দিচ্ছে। তারা বড় বড় চাষি আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত করছে। এটা একটা অদ্বিতীয় পার্টি। কমরেড শিবদাস ঘোষের আদর্শে দীক্ষিত বলেই এই পার্টি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে পারবে। এটাই গুরুত্বপূর্ণ কথা। বর্তমান নেতৃত্ব সেই শক্তিতে বলীয়ান। ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টি হিসাবে আপনাদের দল ও আমাদের দল মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা ও আন্তর্জাতিকতার ভিত্তিতে পারস্পরিক পরামর্শ ও সহযোগিতা গ্রহণ করে। কিন্তু কেউ অপরের উপর মত চাপিয়ে দিই না। আমাদের সম্পর্ক দ্বান্দ্বিক। আমাদের কমরেডদের কমরেড শিবদাস ঘোষের আদর্শ ও চিন্তায় গড়ে ওঠা উচিত। তাঁদের জীবন অভ্যাস সংস্কৃতি এবং সমস্ত রকমের মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা অর্জন করা দরকার। কমরেড প্রভাস ঘোষ এ ক্ষেত্রেও সাহায্য করেন। তাঁর সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই। আমি অনেকদিন থেকে লক্ষ করছি এখানকার পার্টির এখন এক চমৎকার অবস্থা। কমরেড নীহার মুখার্জীর মৃত্যুর পর বহু কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে তাঁকে যেতে হয়েছে। এতদিন পরে কমরেড প্রভাস ঘোষ সমগ্র পার্টির প্রকৃত নেতায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। জনপ্রিয়তার ভিত্তিতে তিনি নেতায় পরিণত হয়েছেন তা নয়। জীবনের সর্বদিককে ব্যাপ্ত করে সংগ্রামের যে ধারণা কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন তাকেও নানা দিক থেকে তিনি বিকশিত করেছেন, নতুন নতুন সমস্যার সামনে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা প্রয়োগ করে তিনি দলকে সমৃদ্ধ করছেন। এ সব কিছুর মধ্য দিয়ে আমি মনে করি তিনি যৌথ নেতৃত্বের আজ বিশেষীকৃত রূপ যার মধ্য দিয়ে সমগ্র পার্টি আজ সংঘবদ্ধ। কমরেড প্রভাস ঘোষ একা যৌথ নেতৃত্ব হিসাবে বিকশিত হননি। তাঁর বিকাশও হয়েছে অন্যান্য কমরেডদের সাথে দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ক পরিচালনার মধ্যে দিয়ে এবং এই পথেই কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা তাঁর মধ্যে বিশেষীকৃত হয়েছে। আমি জানি আমার থেকে বেশি আপনারা এটা গ্রহণ করেছেন। ইতিমধ্যে তাঁর কিছু বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। আমরা এখান থেকেও কিছু শিক্ষা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছি। কমরেড নীহার মুখার্জীর পরবর্তীতে এখন তিনি দক্ষ এবং প্রাজ্ঞ নেতা, এই আমার ধারণা। এজন্য তাঁর প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা আছে। ছোটবেলা থেকে আমরা বন্ধু, আবার আমি তাঁকে নেতা হিসাবে মানি। এই পার্টির ভবিষ্যৎ আছে। মহান মার্কসবাদী কমরেড শিবদাস ঘোষ এই পার্টি গড়ে তুলেছেন। আমি আমার বক্তব্য কিন্তু গুছিয়ে একের পর এক রাখতে পারলাম না। এটা আমার লিমিটেশন। আমি ক্লাস এইট পাশ করতে পারিনি। তার পরে আমি পড়াশুনা চালাতে পারিনি। সেই জন্য আমার অনেক সীমাবদ্ধতা আছে।

কমরেড আমি আপনাদের বলি আপনাদের হাতে আছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা, এক শক্তিশালী হাতিয়ার আর আছে একদল শক্তিশালী নেতা। এখানেই আমি শেষ করছি। তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসকে আমার

আটের পাতায় দেখুন

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

রাজ্য জুড়ে বিদ্যাসাগর স্মরণ

সারা বাংলা সেভ এডুকেশন কমিটি সহ বিভিন্ন সংগঠন ২৯ জুলাই বিদ্যাসাগরের ১৩১তম প্রয়াণ দিবস পালনের উদ্যোগ নেয় সারা রাজ্য জুড়ে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ বাতিলের দাবিতে 'সেভ এডুকেশন ডে' হিসাবে পালন করে সেভ এডুকেশন কমিটি। এই দিন কলকাতায় কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগর মূর্তির কাছে দু'ঘণ্টার অবস্থান কর্মসূচির অনুমতি দিতে পুলিশ অস্বীকার করে।

কমিটির কর্মকর্তারা সকাল ১১টায় বিদ্যাসাগরের মূর্তিতে মাল্যদান করেন। রাজ্যের প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল এবং কমিটির উপদেষ্টা বিমল চ্যাটার্জী বিজেপি সরকারের শিক্ষার গৈরিকীকরণের ষড়যন্ত্রের সমালোচনা করে বলেন, আমরা মুক্ত শিক্ষা চাই কিন্তু কোনও গৈরিক শিক্ষা চাই না। কমিটির সভাপতি ও প্রাক্তন উপাচার্য চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী বলেন, এই শিক্ষানীতি শিক্ষার প্রাণসত্তাকে বিনষ্ট করবে (ছবি)। সম্পাদক অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর এই শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

কমিটির তরফ থেকে বিদ্যাসাগরের মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান অধ্যাপক মহীদাস ভট্টাচার্য, কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য শুভঙ্কর ব্যানার্জী, তপন চক্রবর্তী, ইমতিয়াজ আলম প্রমুখ। সারা বাংলা বিদ্যাসাগর দ্বিশতজন্মবর্ষ উদযাপন কমিটির পক্ষ থেকে দিনটি শ্রদ্ধার সাথে রাজ্য জুড়ে পালন করা হয়। ডিএসও, ডিওয়াইও, এমএসএস, পথিকৃৎ ও কমসোমলের পক্ষ থেকেও বিদ্যাসাগরের মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়।

যথার্থ আদর্শ চাই, যথার্থ বিপ্লবী দল চাই

একের পাতার পর

না, চরিত্র বাঁচবে না, কোনও কিছু বাঁচবে না। আমি যদি একটা সুখের সংসার গড়বার চেষ্টা করি সেই পরিবারের ভিতরেই দুষ্টশক্তি ঢুকে আমার স্নেহের সন্তানটিকে নষ্ট করে দেবে। সেটি বড় বড় ফিল্মস্টারদের ফ্যান কিংবা চ্যালা হবে, নাকি ওয়াগন ব্রেকারের দলে নাম লেখাবে— এই সব বিষয়ে আজ নিশ্চিত করে কে বলতে পারে? প্রাণ দিয়ে ভালবেসে যাকে গড়ে তুলব সে বিট্রে করে চলে যাবে, এটাই বাস্তব স্থিতি। বাস্তব পরিস্থিতি এমনই যে, পয়সার জন্য সে কোনও কিছুই পরোয়া করবে না। আজকের সমাজ এই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। এখান থেকে যদি ভালবাসাকে বাঁচাতে হয়, নীতিনৈতিকতাকে বাঁচাতে হয়, দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যবোধকে বাঁচাতে হয়, মানুষকে বড় করতে হয়, নিজেকেও যদি বড় হতে হয়, আমার স্নেহের পাত্রপাত্রীগুলিকে যদি বড় করে গড়ে তুলতে হয় তা হলে তাদের সামনে সঠিক রাস্তা খুলে দিতে হবে। আর লড়াই করা ছাড়া কোনও দ্বিতীয় রাস্তা নেই। এটা আমি বুঝে ফেলেছি। আমি কেন এরকম বুঝলাম তা নিয়ে রাগ করব কার ওপর? এ নিয়ে তো কারও সাথে তর্ক করা যায় না যে, তুমি বোঝোনি, আমি বুঝলাম কেন? আর বুঝলাম বলেই তো আমার বিপদ হয়ে গিয়েছে।

এখন আমার সামনে দু'টি রাস্তা খোলা আছে। হয় সব জেনে-শুনে, বুঝেও নিজেকে অধঃপতিত করা, নিজের বিবেক বিক্রি করা, আর না হয় লড়াই করা। এই লড়াইয়ে আমি জিতব কি হারব, সে ইতিহাস বলবে। কিন্তু আমি যা সত্য বলে মনে করি— ভারতবর্ষে নতুন করে একটা বিপ্লবী দল গড়ে তুলতে না পারলে মানুষের মুক্তি আসবে না, তা ভুল পথে গিয়ে হাজার মানুষ কোরবানি করুক কিংবা লক্ষ লক্ষ ছেলে রক্ত ঢেলে দিক, সব বিফল হয়ে যাবে। তাই যথার্থ আদর্শ চাই, যথার্থ বিপ্লবী দল চাই। "

(১৯৭৪ সালে রাজনৈতিক শিক্ষাশিবিরের অপ্রকাশিত আলোচনা থেকে)

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর ভাষণ

সাতের পাতার পর

অভিনন্দন। আমাদের পার্টি বাসদ (মার্কসবাদী) আমাকে এই বার্তা পৌঁছে দিতে বলেছে যে, আমরা সেখানে একটি বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলার চেষ্টা করছি। আমরা নানা দিকে বিকাশের স্তরে আছি। সংগ্রামের পথে যদিও নানা জটিল এবং বিভিন্ন প্রতিকূলতাও থাকে, তবু আমরা এই বিশ্বাস রাখি যে, বাংলাদেশে আমরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় একটি শক্তিশালী বিপ্লবী দল গড়ে তুলব। আমার বয়স এখন ৮৫ বছর, আরও পাঁচ-ছয় বছর বাঁচব। (হেসে বলেন) কমরেড প্রভাস ঘোষ অবশ্য তা বিশ্বাস করে না। সে বলে যে, আমি দুই-তিন বছর পরে মারা যাব। আমি বলেছি, না, পাঁচ বছর বা আরও বেশি বাঁচব, কারণ আমি রোজ কিছু কিছু ব্যায়াম করি। আপনাদের অনেক ধন্যবাদ। আপনারা আমাকে অনেক সময় দিয়েছেন।

পলিটবুরো ও কেন্দ্রীয় কমিটির নতুন সদস্য

এস ইউ সি আই (সি) কেন্দ্রীয় কমিটির ২৫-২৯ জুলাইয়ের সভায় ৬ জনকে পলিটবুরোতে এবং ৫ জনকে কেন্দ্রীয় কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে

যাঁরা পলিটবুরোয় অন্তর্ভুক্ত হলেন ঃ

কমরেড ভি ভেনুগোপাল
কমরেড কান্তিময় দেব
কমরেড রবীন সমাজপতি
কমরেড স্বপন ঘোষ
কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জী
কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য

যাঁরা কেন্দ্রীয় কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হলেন ঃ

কমরেড এ রেঙ্গাস্বামী
কমরেড জয়সন জোসেফ
কমরেড বি এস অমরনাথ
কমরেড অরুণ ভৌমিক
কমরেড দেবাশীষ রায়

জীবনবোধ

চারের পাতার পর

নীল আরিফ মাহমুদ ঃ কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী অনন্তকাল বেঁচে থাকবেন, তাঁর আলোয় আলোকিত সকল মানুষের মনে। তাঁর নীতি, আদর্শ, সত্য প্রতিষ্ঠার এই লড়াইয়ে তিনি আছেন, তিনি থাকবেন।

কল্লোল দাশ বনি ঃ কিউবাতে ছিলেন চে গুয়েভারা, আমাদের ছিলেন হায়দার ভাই। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে তাঁর নেতার নির্দেশে বাংলাদেশে বৈষম্যহীন শোষণমুক্তির সমাজবিপ্লব করতে তিনি এসেছিলেন ভারত থেকে এক কাপড়ে খালি হাতে।... ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কখনওই কিছু করেননি, মানুষের প্রয়োজনে, মানুষের জন্য আজীবন বিপ্লবী অকৃতদার এই ব্যক্তি তার সমগ্র জীবন বিলীন করে দিয়ে গেছেন। বাংলার জমিনে এমন জ্ঞানী, বিদগ্ধ, সর্বস্বত্যাগী অগ্নিপুরুষ আর একজন জন্মাবে কি না সন্দেহ হয়।

কাজি শফিকুল ইসলাম রাব্বি ঃ হায়দার ভাই দেহত্যাগ করেছে, আমি সহ হাজার হাজার ছেলেমেয়ে যারা গর্বের সাথে হায়দার ভাইয়ের গল্প করেছি একবার হলেও, তাদের মাঝেই হায়দার ভাই বেঁচে থাকবে। যে দালান তৈরি করতে আমরা ইট রেখেছি, রাখছি, সেই দালান নির্মাণের পর আমি সহ অনেক শ্রমিকের নাম থাকবে না। কিন্তু দালানের কিছুটা অংশ জুড়ে হায়দার ভাই-এর নাম থাকবে।

রহিমা আক্তার ঃ বাংলাদেশের বিপ্লবী রাজনীতির ইতিহাস তো হায়দার ভাইয়ের জীবন সংগ্রাম ছাড়া লেখা হবে না। পরিবর্তিত সমাজ সযতনে লিখবে হায়দার ভাইয়ের জীবনগাথা। আমি যখন বুড়ো হব, তখনও পিছন ফিরে তাকিয়ে বলব কী অসম্ভব কাজ! কী দুর্ধর্ষ সাহস! কী অমিয় তেজ! নিজ ভাবনায় অনড়। নিজ পথে অবিচল। প্রচলিত চিন্তাকে তছনছ করে দেওয়ার ভীষণ রকমের অভিযান।

মাসুদা আক্তার ঃ পৃথিবীর বুকে মানুষের সবচেয়ে বড় জিনিস হল মানুষের বিবেক মনুষ্যত্ব জাগানো, সেটা আপনি হাজার হাজার মানুষের মাঝে জাগিয়ে তুলেছেন, মানুষকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে শিখিয়েছেন, হাজার হাজার ছেলেমেয়ে আপনার আদর্শে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে, তাদের মাঝে আপনি আশার আলো দেখিয়েছেন, সমাজে কীভাবে মানুষ হিসাবে মাথা উঁচু করে বাঁচতে হয় তা আপনি শিখিয়েছেন।

লিপন আহমেদ ঃ হায়দার ভাই, আপনাকে একদিন কথা দিয়েছিলাম, শেষ পর্যন্ত লড়ব। রাখিনি। হায়দার ভাই, আপনার কাছে ক্ষমা চাই। যেটুকু গড়ে দিয়েছিলেন ভেতরে মননে সেটা এখনও মানুষ করে রেখেছে আমাকে।

অপু কুমার দাশ ঃ পৃথিবীতে আর কোনও অর্জন না থাক এমন বটবৃক্ষের ছায়া পেয়েছিলাম। কোনও একদিন হয়ত গল্পে বলতে পারব এত বড় মানুষের এত মহৎ হাত ধরে হেঁটেছিলাম কিছুদিন।

জহিরুল ইসলাম ঃ বাংলাদেশের বামপন্থী আন্দোলনের প্রকৃত নক্ষত্র কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী আর নেই। যার শিক্ষায় আজীবন বিপ্লবী, সৎ মানুষ হতে চেয়েছিলাম। আজীবন বিপ্লবী হওয়ার সংগ্রাম করতে পারিনি। কিন্তু আপনার সংগ্রাম, জীবনবোধ ও ইস্পাত-কঠোর ব্যক্তিত্ব এখনও সৎ থাকার অনুপ্রেরণা জোগায়।

আলমগীর কবির ঃ তাঁর সমগ্র জীবন কাটিয়ে দিলেন নিপীড়িত মানুষের মুক্তির জন্য সংগ্রামে, শিল্প-সাহিত্য-দর্শন-সঙ্গীত-চিত্রকলা-খেলাধূলা এমনকি বিজ্ঞানের অনেক বিষয়ে তাঁর সাথে আলাপচারিতায় যে কাউকে মগ্ন করে রাখার মতো মানুষ ছিলেন তিনি। অ্যাকাডেমিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও যে জীবনবোধের কতটা গভীরে মানুষ পৌঁছাতে পারে, মুবিনুল হায়দার চৌধুরীকে যারা নিকট থেকে দেখেছেন, তারা বুঝতে পারবেন। ব্যক্তিগত কোনও সম্পদই তিনি রেখে যাননি, সমাজতান্ত্রিক আদর্শে দীক্ষিত হয়ে তিনি তাঁর সমগ্র জীবনকে ব্যাপ্ত করে এক নিরলস সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন এ দেশের খেটে-খাওয়া মানুষের চূড়ান্ত মুক্তির লক্ষ্যে একটি সঠিক আদর্শবান বিপ্লবী দল গড়ে তোলার জন্য।

সুব্রত দেবনাথ ঃ রাজনৈতিক জীবনে যে মানুষটির সংস্পর্শ চিন্তার জগতকে নাড়া দিয়েছিল, যার দৃঢ়তা, প্রজ্ঞা, জ্ঞান অভিভূত করেছিল, বর্তমানে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-র সাধারণ সম্পাদক ও এই দেশের ইতিহাসের বামপন্থী আন্দোলনের পুরোধা কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী আজ রাত ১০-৫০ মিনিটে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বাংলাদেশের বামপন্থী রাজনীতিতে এক বিচক্ষণ, প্রজ্ঞাবান নেতার মহাপ্রয়াণ হল। বাম রাজনীতিতে তাঁর মৃত্যু অপূরণীয় ক্ষতি হিসাবেই বিবেচিত হবে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com